Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারুফা হোসাইন মিরা

রোলঃ 216022390

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারুফা হোসাইন মিরা

রোলঃ 216022390

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মারুফা হোসাইন মিরা, আইডিঃ 216022390 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মারুফা হোসাইন মিরা উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

মারুফা হোসাইন মিরা

আইডিঃ 216022390

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

ভাষা 7

আরবি ভাষা 9

আত্মপরিচয়ে ভাষা 10

সংকট ও আগ্রাসন 11

বাস্তবতা ও নিরসন 12

আরবি ভাষার উৎস 13

আরবি সেমিটিক শাখার একটি ভাষা 15

সাফাইটিক এবং হিসমাইক আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপ 17

পুরাতন আরবি 20

আইন আভদাতে পাওয়া আরবি ভাষার প্রাচীনতম শিলালিপি 22

পুরাতন আরবির একটি নিদর্শন 'আন-নামারা' শিলালিপি 24

আরবী ভাষার ক্রমবিকাশ 26

ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী আরবি 31

নিউ-আরবি এবং মধ্য আরবি 33

ইলমুল দবত (কুরআনের হরফ এবং হরকতের ক্রমবিকাশ) 35

হারফসমূহের ক্রমবিকাশ 36

হরকতের ক্রমবিকাশ 45

আরবী ভাষা চর্চার গুরুত্ব 57

আরবি ভাষা শিক্ষার আরো কিছু কারন 60

আরবী ভাষা শিক্ষার ৭ টি কারন 63

ইসলামে আরবী ভাষা, এর গুরুত্ব ও উম্মতের পুনর্জাগরণে এর ভূমিকা 65

মু'জিযা 69
ঐতিহাসিকভাবে এ ভাষার অবহেলা ও এর পরিনাম..69
এ ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য...71
আরবী ভাষার কিছু গ্রামাটিককল স্ট্রাকচার 73
ইজতিহাদ 77
উম্মাহ্‌র পুনর্জাগরণ 79
মুসলিমদের জন্যে আরবী ভাষা শিক্ষার আরো ১০ টি কারন 80
জ্ঞানচর্চায় মুসলিম নারীদের অবদান...83
যুগে যুগে আরবী ভাষা সংরক্ষণে নারীর ভূমিকা...96
আরবি ভাষা শেখার কৌশল 100
আরবি ভাষা শিক্ষার কিছু গ্রন্থ..102
আরবি ভাষা কম্পিউটারের সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যিনি.............................103
শেষ কথা..109
রেফারেন্স..111

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক যিনি নভোমন্ডলে যা আছে এবং ভূমন্ডলে যা আছে সব কিছুর মালিক যিনি তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণের প্রতীক ও রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন অতঃপর লাখো-কোটি দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর উপর।

আল্লাহ তায়ালা আরবি ভাষাকে ইসলামের ধর্মীয় ভাষা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এভাবে কুরআন, হাদীছ এবং সকল ইসলামী শিক্ষা আরবী ভাষায় দেয়া হয়। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে ব্যবহৃত বিশ্বের সমস্ত ভাষা থেকে এটি বেছে নেওয়া হয়েছিল। আরবি শেখার কারণ
হিসেবে এই সত্যটিই যথেষ্ট, বিশেষ করে যেহেতু এটি কুরআনে নিশ্চিত করা হয়েছেঃ "নিশ্চয়ই আমি এটাকে আরবী কোরআন হিসেবে নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো।"
এই আয়াতটি দিয়ে বোঝায় যে আরবিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল কারণ এটি এমন একটি ভাষা যা প্রতিটি মানুষের বোঝার ক্ষমতা রয়েছে। এটির আরো গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এটিকে অন্যান্য ভাষার তুলনায় অনন্য করে তোলে। আল্লাহ তাআলা যদি কুরআনকে প্রতিটি ভাষায় নাজিল করতে চাইতেন, তাহলে তিনি তা
করতে পারতেন।

কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এই ভাষা শেখার মাধ্যমে আমরা কোরআন এর সকল অর্থ ভালোভাবে বুঝতে পারব। যখন কেউ শব্দগুলি বুঝতে পারে তখন তারা কোরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরি করে। আরবি ভাষা শেখা কেবল কোরআন পড়ার ক্ষেত্রেই নয়, মুখস্থ করতেও সহায়তা করে। আমরা যখন কোরআনের শব্দগুলি বুঝতে

পারি তখন এটি আমাদের দৈলনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা সহজ হয়ে যায়। যখন কোরআনের ভাষা বোঝা যায় তখন আমরা আল্লাহর সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করতে পারব কারণ সেগুলি তাঁর বাণী এবং আদেশ।কোরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ "এবং আমি অবশ্যই কুরআনকে মুখস্থ করার জন্য সহজ করে দিয়েছি, সুতরাং কেউ কি আছে যে মুখস্থ করবে?"

কোরআন পরিবর্তন বা এরকম আরো একটা গ্রন্থ তৈরি করার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। কোরআন আল্লাহ তায়ালা অনেক গুরুত্ব এর সাথে পাঠিয়েছেন তাই কোরআন ভালোভাবে বুঝতে আমাদের অবশ্যই আরবি শিখতে হবে। অন্যথায় আমরা এর মাহাত্ম্য থেকে বঞ্চিত হব এবং এর ভাষার গভীরতা এবং নির্ভুলতা বোঝার ক্ষমতা আমাদের থাকবে না।

ইসলামি শিক্ষার বেশিরভাগই আরবি ভাষায়। এর মধ্যে রয়েছে আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা, সুন্নাহ এবং হাদীছ যা তিনি আমাদের প্রদান করেছেন। কোরআন ও হাদিসের বেশির ভাগই আরবি ভাষায় রয়েছে। যদিও এর মধ্যে কিছু ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে, তবে অর্থ কিছুটা ভিন্ন থাকে কারণ আল্লাহর ভাষা অনুবাদ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয় তাই কোরআন ও হাদিস সব ভালোভাবে বুঝতে আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

ভাষা

তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে। [রূম: ২২]

ভাষা একে অপরের সাথে চিন্তা, ভাবনা ও ধারনার যোগাযোগের মাধ্যম। এর মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনা একজন থেকে অন্যজনে প্রবাহিত হয়, এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রবাহিত

হয়। লিখিত হোক বা অলিখিত, এটাই মানুষের জন্য চিন্তা-চেতনা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে প্রাচীনকাল হতে। ভাষা অবশ্যই আমাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার অংশ নয় বরং এর ফলাফল। এ বিষয়টি Rational ও Empirical উভয় চিন্তার পদ্ধতি দ্বারাই প্রমাণ করা সম্ভব। এটা আমরা বুঝতে পারি যখন আমরা দেখি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে একই চিন্তা-চেতনা একই ভাবে বিরাজ করে কিন্তু তা প্রকাশ করার সময় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করে। উদাহরনসরূপ, একজন ইংরেজ, একজন চাইনিজ, একজন জার্মান কিংবা একজন বাঙ্গালী ভিন্ন ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও কমিউনিজমকে তাদের আদর্শ হিসেবে নিতে পারে। ভিন্ন ভাষা তাদের আদর্শিক চিন্তার মধ্যে কোনো পার্থক্য ঘটায় না।

ভাষা অনেকটা মানুষের মতোই। এর উদ্ভব হয়, বিবর্তন হয়, উন্নতি হয়, দূর্বলতা দেখা দেয় এবং কখনো কখনো ভাষার মৃত্যু তথা বিলুপ্তিও দেখা দিতে পারে। ভাষার উৎপত্তি মূলত কথ্য রুপে শুরু হয়, পরবর্তীতে তা লিখিত রুপে আসে এবং কোনো প্রতিষ্ঠিত ভাষার পন্ডিতগণ সাধারণত তখনই ভাষার নিয়মনীতি তথা ব্যকরণ রচনা করেন যখন তারা ভাষার বিকৃতির আশঙ্কা করেন।

ভাষা আল্লাহ তায়ালার অনন্য দান, শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে। এই ভাষা মানুষের চিন্তা চর্চার বাহন, মানব পরিচয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।’ (সুরা রুম : ২১-২২)।

আরবি ভাষা

আরবি ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। সব ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে এ ভাষা হচ্ছে চিরযৌবনা ভাষা। এর কোনো শৈশব বা বার্ধক্য নেই। এ ভাষায় কোরআনে কারিমের অবতরণ একে আরও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

কবি হাফেজ ইবরাহিমের ভাষায়, 'আমি সমুদ্রের মতো বিশাল, আমার গভীরে রয়েছে অসংখ্য মণিমুক্তা। তারা ডুবুরিকে জিজ্ঞেস করেছে আমার এ সম্পদের বিষয়ে?' কোরআনের ভাষা হওয়ার সুবাদে এ ভাষার কোনো মৃত্যু নেই। এর প্রবাহ অবিনাশী ও অবিনশ্বর। এর বিকাশধারা চির বহমান।

আরবি নামটি শুনলে প্রথমেই আমাদের মনে আসে এটি পবিত্র কুরআনের ভাষা, যা ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। সারা বিশ্বের মুসলমানরা প্রতিদিন তাদের প্রার্থনায় আরবি ভাষায় কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে থাকেন। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আরবি ভাষা মুসলমানদের কাছে একটি অতি পবিত্র ভাষা হিসেবে গণ্য।সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাতৃভাষা ছিল আরবি, আর আল্লাহ জিব্রাইলের (আ.) মাধ্যমে তার উপর এই ভাষায় ওহী নাযিল করতেন। ঐতিহাসিকভাবে মুসলিমদের বিশ্বাসমতে, আরবিই সেই ভাষা যার মাধ্যমে জান্নাতে মানুষ একে অন্যের সাথে বা ফেরেশতাদের সাথে যোগাযোগ করবে।

আরবি হলো বিশ্বের বহুল ব্যবহৃত কথ্য ভাষাগুলোর মধ্যে একটি। ব্যবহারের দিক থেকে এটি পঞ্চম স্থানে, যা আজকের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে একটি সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এমনকি এর ব্যবহার বিভিন্ন উপভাষাতেও রয়েছে। উপরেই বলা হয়েছে, আরবি ভাষা মুসলিমদেরর কাছে একটি ধর্মীয় ভাষা হিসেবেও কাজ করে। কারণ, আরবি হলো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষা, এবং এটি ইসলাম ধর্মের সাথে সরাসরি যুক্ত।

এই আরবি ভাষা কোথা থেকে এসেছে? এর জন্ম কীভাবে হলো? আর, কীভাবেই বা এর পরিবর্তন ঘটেছে?

আরবি ভাষা, যাকে আরবিতে 'আল আরাবিয়া' বলা হয়। প্রায় ২৯৩ মিলিয়ন স্থানীয় ভাষা ব্যবহারকারী, এবং বিশ্বব্যাপী মোট ৪২২ মিলিয়ন মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলেন। বিশ্বের ২৬টি দেশের অফিসিয়াল ভাষা আরবি। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ছয়টি ভাষার মধ্যে অন্যতম চতুর্থ ভাষা হচ্ছে আরবি। কুরআনের ভাষা হিসেবে এটি সারা বিশ্বের ১.৭ বিলিয়ন মুসলমানের ধর্মীয় ভাষাও। যদিও তাদের অধিকাংশই আরবি ভাষায় মনের ভাব আদান-প্রদান পারে না, কিন্তু প্রার্থনা এবং ধর্মীয় অধ্যয়নের জন্য আরবি ভাষা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান তাদের অধিকাংশেরই রয়েছে। এই ভাষার রয়েছে বিভিন্ন বৈচিত্র্য। প্রধান বৈচিত্র্যগুলোর মধ্যে একটি হলো কুরআনের শাস্ত্রীয় আরবি। অনেকে একে আরবি ভাষার সবচেয়ে নিখুঁত রূপ বলে মনে করেন, এবং কেউ কেউ বলেন যে, এটি একমাত্র সত্যিকারের আরবি, কারণ এটাই ছিল সেই ভাষা যে ভাষায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ শেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে কুরআন অবতীর্ণ করেন। তারপর রয়েছে মডার্ন স্ট্যান্ডার্ড আরবি, যা আজ অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত আরবি ভাষার একটি রূপ। এটি সাহিত্যে ব্যবহৃত আরবির আধুনিক রূপ, যা কুরআনের ধ্রুপদী আরবির উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটা ঠিক শাস্ত্রীয় আরবির মতো নয়, কিন্তু উভয়কেই আরবরা 'আল-ফুশা' বলে উল্লেখ করেছে, যার অর্থ 'বাকপটু বক্তৃতা'।

আত্মপরিচয়ে ভাষা

আরবি ভাষা আরব জাতির এমনকি মুসলিম জাতির আত্মপরিচয়। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তাদের মূল্যবোধ। আরবি ভাষা মিশে আছে আরব জাতির অস্তিত্ব-চেতনায়। এর আবেদন আবহমান-চিরায়ত, শাশ্বত। স্বদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তাদের

প্রতি দায়বদ্ধতার চেতনা এ ভাষার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। প্রত্যেক জাতির অনন্য পরিচায়ক এ ভাষাসম্পদ। অতএব, আরবি ভাষাকে কেন্দ্র করেই আরবরা স্বতন্ত্র জাতি হয়ে উঠেছে।

সংকট ও আগ্রাসন

বিশ্বায়নের দাপুটে প্রভাবে সব দেশই তাদের মাতৃভাষা নিয়ে চিন্তিত। বিশ্বের সংযোগ-ভাষা হয়ে ওঠায় ইংরেজির দাপট বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর ছোট-বড় অনেক ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। আরবি ভাষাও এ সংকট মুক্ত নয়। আরব বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইংরেজির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

অনেক অফিসের কাজের ভাষা হয়ে গেছে ইংরেজি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পড়ানো হচ্ছে ইংরেজিতে। মিডিয়ায়, নাটকে, অনুষ্ঠানাদিতে চলছে ইংরেজি ও বিদেশি ভাষার আধিক্য। মিডিয়াকর্মী, গবেষক এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বক্তাদের ভাষায় আজ ইংরেজি শব্দের ছড়াছড়ি। তরুণ-তরুণীদের মাঝে ইংরেজিপ্রীতি বাড়ছে ভয়ানকভাবে।

তাদের কথায়, আচরণে বিদেশি ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আরবি ভাষা তাদের কাছে অবহেলিত। আরবির অশুদ্ধ বানান, অশুদ্ধ শব্দপ্রয়োগ, অশুদ্ধ বাক্যগঠন সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। দোকান, রেস্তোরাঁর বিলবোর্ডে, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে আরবি হরফে দেখা যাচ্ছে ইংরেজি শব্দ বা বাক্য অথবা সরাসরি ইংরেজি নামের ব্যবহার।

স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আজ বিশুদ্ধ আরবির পরিবর্তে আঞ্চলিক এবং বিদেশি শব্দ ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। আরবি ভাষা পরিস্থিতি এখন চরম নৈরাজ্য ও বিভ্রান্তিকর অবস্থার শিকার। বিদেশি ভাষার আগ্রাসন মূলত আরব জাতির জন্য এক বিরাট ভাষিক সংকট।

সমাধান ও উত্তরণ

আরবি ভাষার মতো এমন একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও মহিমান্বিত ভাষার এ সংকট মোকাবিলায় সবাইকেই কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। আরবির ক্ষেত্রে এ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে আরব দেশগুলোকে বিশেষভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এ সংকট এবং ভাষাগত নেতিবাচক প্রভাব থেকে বাঁচতে আরব বিশ্বের ভাষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আরবি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন আয়োজন, সভা-সেমিনারের মাধ্যমে সর্বস্তরে সচেতনতা, উপযুক্ত কর্মপ্রয়াস জোরদারের বিকল্প নেই।

বাস্তবতা ও নিরসন

আরবি ভাষা ব্যবহারে বা শেখায় অনেকেরই হীনমন্যতা কাজ। মূলত সবার হৃদয় থেকে এটা ত্যাগ করতে হবে। আরবি ভাষা এবং আরব জাতির আত্মপরিচয় বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সবাইকে আরবি ভাষা শেখায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। মিডিয়া, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলোতে বিশুদ্ধ আরবি ব্যবহার করতে হবে।

কোরআন ও হাদিসের মাধ্যমে যেই ভাষা অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, তার শুদ্ধ প্রয়োগ এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণে গুরুত্ব দিতে হবে। বিকৃতি থেকে একে রক্ষা করতে হবে। আরব দেশগুলোর তত্ত্বাবধানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত মুসলিম দেশগুলোতে আরবি ভাষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন আয়োজন এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আরবির প্রচার প্রসারে কাজে লাগাতে হবে। যত্নের সঙ্গে আরবি শুদ্ধভাবে শিখতে হবে, বলতে হবে, লিখতে হবে। এ ভাষাকে চির সজীব রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা

করতে হবে। কারণ, এ ভাষা আরব জাতি ও মুসলিমদের শুধু প্রিয় ভাষা নয়; বরং তাদের আত্মপরিচয়।

আরবি ভাষার উৎস

আরবি একটি সেমিটিক ভাষা, যা মূলত আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষা-পরিবারের একটি অংশ। এটি এই পরিবারের প্রোটো-সেমিটিক শাখা থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো- এটি সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্যান্য উপগোষ্ঠীর (যেমন- উত্তর-পশ্চিম সেমিটিক, সেন্ট্রাল সেমিটিক, দক্ষিণ সেমিটিক, পূর্ব সেমিটিক, পশ্চিম সেমিটিক) ভাষার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, যার মধ্যে রয়েছে হিব্রু, আরামাইক, সিরিয়াক, ফিনিশিয়, মিশরীয়, ক্যানানাইট, প্রাচীন উত্তর ও দক্ষিণ অ্যারাবিয়ান এবং ইথিওপীয়সহ অন্যান্য অসংখ্য মৃত ও সকল জীবিত আধুনিক ভাষা। যদি কেউ এই ভাষাগুলোতে কথা বলতে পারে, তা হলে বুঝতে পারবে এদের মধ্যে কত মিল আছে। উদাহরণস্বরূপ, শুধু আরবি এবং হিব্রুতে সালাম এবং শালোমের মতো একটি শব্দের দিকে তাকানো যায়, যার উভয়েরই অর্থ 'শান্তি'।

সেমিটিক ভাষার উপগোষ্ঠীর সর্বোত্তম শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে ভাষাবিদদের মধ্যে এখনও ভিন্নমত দেখা যায়। সেমিটিক ভাষাগুলো প্রোটো-সেমিটিক এবং মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষার উদ্ভবের মধ্যে, বিশেষত ব্যাকরণে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বলে তারা মনে করেন। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়- আরবি ভাষা সেমিটিক ভাষা পরিবার থেকে এসেছে, এবং এটি ঐ পরিবারের অন্যান্য সেমিটিক ভাষার সাথে বিকশিত হয়েছে। সেই দিক থেকে বিশেষ করে আরবি ভাষা মূলত কোনো নির্দিষ্ট ভাষা কোথা থেকে এসেছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেশ কঠিন, কারণ ভাষা সর্বদা পরিবর্তিত এবং বিকশিত হয়।

আরবি এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষা, যেমন- হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় সব একই প্রোটো-সেমিটিক ভাষা থেকে বিকশিত হয়েছে। আরবি ভাষা মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক

শাখার অন্তর্গত একটি ভাষা, যেখানে সেন্ট্রাল সেমিটিকের আরেকটি শাখা থেকে হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় ভাষাগুলো এসেছে। সেমিটিয় গোত্রের ভাষাসমূহের অন্তর্গত জীবিত সেমিটিক ভাষাগুলো হলো আধুনিক হিব্রু ভাষা (ইসরায়েলের ভাষা), আমহারীয় (ইথিওপিয়ার ভাষা), এবং ইথিওপিয়ায় প্রচলিত অন্যান্য ভাষা। মৃত সেমিটিয় ভাষাগুলোর মধ্যে আছে প্রাচীন হিব্রু, আক্কাদীয় (ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয়), সিরীয় ও ইথিওপীয় ভাষা।

বহু আরব বিশেষজ্ঞ আরবি ভাষার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইবনে আল কালবি তার লিখিত কিতাব আল-আসাম বইয়ে লিখেছেন, ব্যাবিলন থেকে আসা আমালিয়ার জায়ান্টরাই প্রথম আরবিতে কথা বলতেন, এবং তাদের সাথে এটি আরব ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দেন। এছাড়া একটি জনপ্রিয় ও ব্যাপক গৃহীত তত্ত্ব ও ধারণা হলো- আরবি ভাষা দক্ষিণ আরব ও আধুনিক ইয়েমেনের আশেপাশে উদ্ভূত হয়েছে, এবং পরে এটি উত্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। পাঠক, চলুন দেখে আসি ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবার থেকে আরবি ভাষা কীভাবে এলো তার একটি সম্ভাব্য প্রবাহ চিত্র।

আফ্রো-এশীয় > সেমিটিক > পশ্চিম সেমিটিক > সেন্ট্রাল সেমিটিক > উত্তর আরবীয় ভাষা > আরবি ভাষা

প্রাচীনকালে আরবের অধিবাসীরা বিভিন্ন সেমিটিক ভাষায় কথা বলত। দক্ষিণ-পশ্চিমে, প্রাচীন দক্ষিণ আরব পরিবারের (যেমন- দক্ষিণ থামুডিক) অন্তর্গত এবং এর বাইরের বিভিন্ন সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষার ব্যবহার ছিল। বিশ্বাস করা হয়, আধুনিক দক্ষিণ আরবীয় ভাষার (নন-সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষা) পূর্বপুরুষরাও এই সময়ে দক্ষিণ আরবের ভাষায় কথা বলত। উত্তরে, উত্তর হিজাজের মরূদ্যানে, দাদানিটিক এবং তায়মানিটিক শিলালিপির ভাষাগুলোর কিছুটা প্রতিপত্তি ছিল। নজদ এবং পশ্চিম আরবের কিছু অংশে 'থামুডিক সি' নামে শিলালিপিতে প্রাপ্ত একটি ভাষা পণ্ডিতরা খুঁজে পেয়েছেন। পূর্ব আরবে প্রাপ্ত একটি

শিলালিপি থেকে হাসাইটিক নামে পরিচিত একটি ভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া, আরবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, থামুডিক বি, থামুডিক ডি, সাফাইটিক এবং হিসমাইক নামে পণ্ডিতরা চারটি বিভিন্ন ভাষা পেয়েছেন। ভাষাপণ্ডিতদের প্রাপ্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, সাফাইটিক এবং হিসমাইক প্রকৃতপক্ষে আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপ এবং সেগুলোকে পুরনো আরবি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

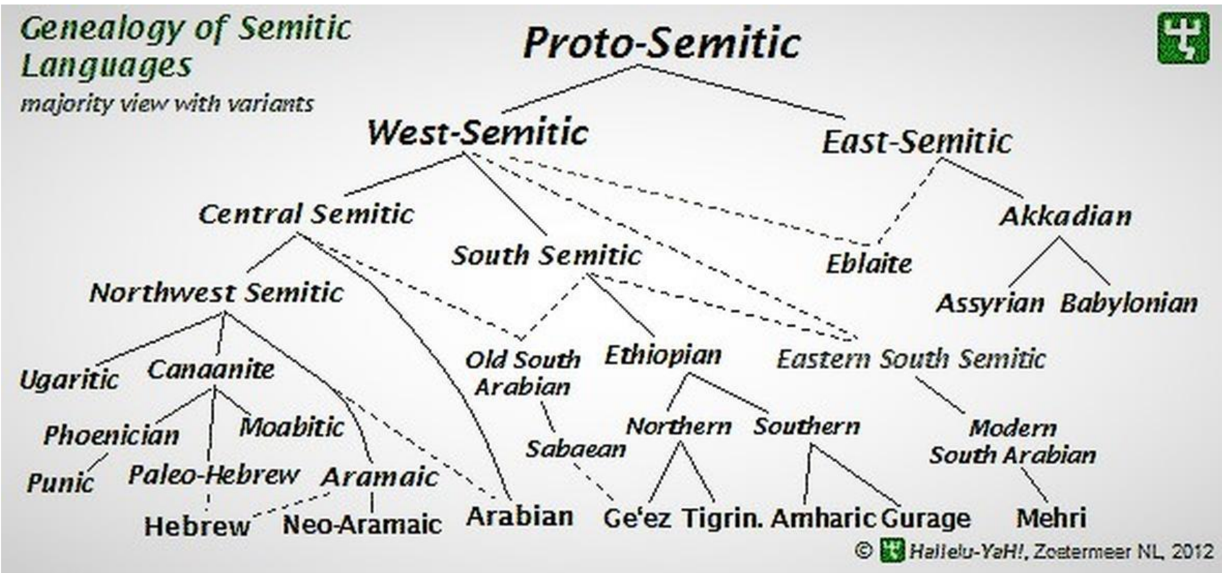

আরবি সেমিটিক শাখার একটি ভাষা

আরবি এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষা, যেমন- হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় সব একই প্রোটো-সেমিটিক ভাষা থেকে বিকশিত হয়েছে। আরবি ভাষা মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক শাখার অন্তর্গত একটি ভাষা, যেখানে সেন্ট্রাল সেমিটিকের আরেকটি শাখা থেকে হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় ভাষাগুলো এসেছে। সেমিটিয় গোত্রের ভাষাসমূহের অন্তর্গত জীবিত সেমিটিক ভাষাগুলো হলো আধুনিক হিব্রু ভাষা (ইসরায়েলের ভাষা), আমহারীয় (ইথিওপিয়ার ভাষা), এবং ইথিওপিয়ায় প্রচলিত অন্যান্য ভাষা। মৃত সেমিটিয় ভাষাগুলোর মধ্যে আছে প্রাচীন হিব্রু, আক্কাদীয় (ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয়), সিরীয় ও ইথিওপীয় ভাষা।

বহু আরব বিশেষজ্ঞ আরবি ভাষার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইবনে আল ক্বালবি তার লিখিত কিতাব আল-আসাম বইয়ে লিখেছেন, ব্যাবিলন থেকে আসা আমালিয়ার জায়ান্টরাই প্রথম আরবিতে কথা বলতেন, এবং তাদের সাথে এটি আরব ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দেন। এছাড়া একটি জনপ্রিয় ও ব্যাপক গৃহীত তত্ত্ব ও ধারণা হলো- আরবি ভাষা দক্ষিণ আরব ও আধুনিক ইয়েমেনের আশেপাশে উদ্ভূত হয়েছে, এবং পরে এটি উত্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। পাঠক, চলুন দেখে আসি ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবার থেকে আরবি ভাষা কীভাবে এলো তার একটি সম্ভাব্য প্রবাহ চিত্র।

আফ্রো-এশীয় > সেমিটিক > পশ্চিম সেমিটিক > সেন্ট্রাল সেমিটিক > উত্তর আরবীয় ভাষা > আরবি ভাষা

প্রাচীনকালে আরবের অধিবাসীরা বিভিন্ন সেমিটিক ভাষায় কথা বলত। দক্ষিণ-পশ্চিমে, প্রাচীন দক্ষিণ আরব পরিবারের (যেমন- দক্ষিণ থামুডিক) অন্তর্গত এবং এর বাইরের বিভিন্ন সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষার ব্যবহার ছিল। বিশ্বাস করা হয়, আধুনিক দক্ষিণ আরবীয় ভাষার (নন-সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষা) পূর্বপুরুষরাও এই সময়ে দক্ষিণ আরবের ভাষায় কথা বলত। উত্তরে, উত্তর হিজাজের মরূদ্যানে, দাদানিটিক এবং তায়মানিটিক শিলালিপির ভাষাগুলোর কিছুটা প্রতিপত্তি ছিল। নজদ এবং পশ্চিম আরবের কিছু অংশে ‘থামুডিক সি’ নামে শিলালিপিতে প্রাপ্ত একটি ভাষা পণ্ডিতরা খুঁজে পেয়েছেন। পূর্ব আরবে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে হাসাইটিক নামে পরিচিত একটি ভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া, আরবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, থামুডিক বি, থামুডিক ডি, সাফাইটিক এবং হিসমাইক নামে পণ্ডিতরা চারটি বিভিন্ন ভাষা পেয়েছেন। ভাষাপণ্ডিতদের প্রাপ্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, সাফাইটিক এবং হিসমাইক প্রকৃতপক্ষে আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপ এবং সেগুলোকে পুরনো আরবি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

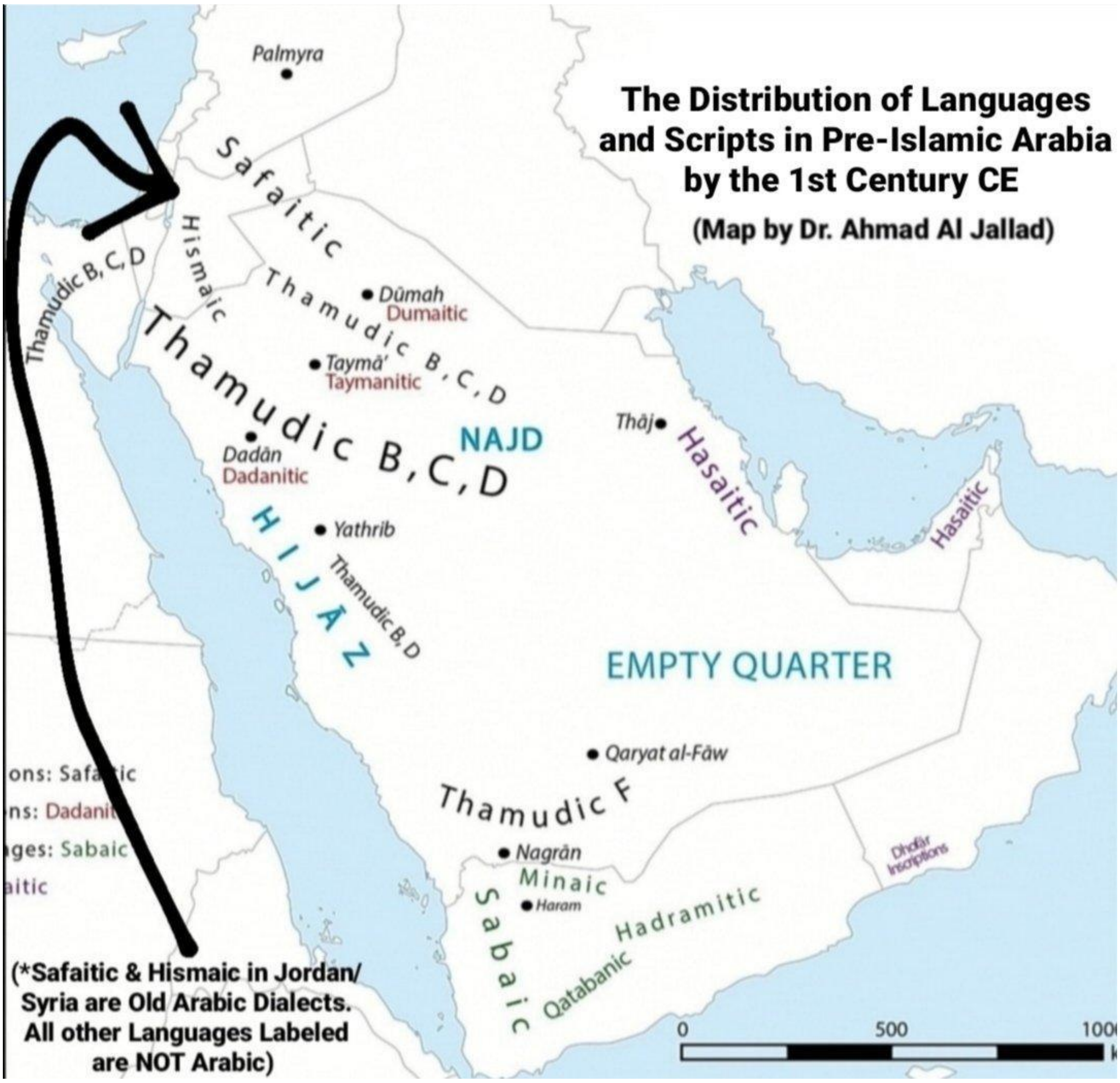

সাফাইটিক এবং হিসমাইক আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপ

আরবি ভাষার উৎপত্তি আদম আঃ এর যুগ থেকে?

অনেকের মতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম আরবি ভাষায় কথা বলেন। আল্লামা জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতির মতে- সর্বপ্রাচীন ও প্রথম ভাষা আরবী ভাষা। কেননা জান্নাতে পরীক্ষার জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালামকে যে শব্দ জ্ঞান ও ভাষা শেখানো হয়েছিল, তা ছিল আরবি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা থেকে বর্ণিত। হযরত আদম আলাই সালাম-এর ভাষা ছিল আরবি।

দুনিয়ায় আসার পর তিনি সুরিয়ানি ভাষায় কথা বলেন। অতঃপর যখন তাঁর তওবা কবুল হয়, তখন আবার আরবি ভাষায় কথা বলতে থাকেন। তাঁর উপর আসমানি সহিফাগুলো আরবি ভাষায় নাযিল হয়। আব্দুল মালিক ইবনে হারিস-এর মতে আদম আলাইহিস সালাম যে ভাষা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন, তা ছিল আরবি। মানব জাতির আদি মানব-মানবী যেমন আরব ভূমিতেই আবির্ভূত হন, তেমনি আদি মানবগুষ্ঠির ভাষার সৃষ্টি ও এখানেই।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন, ভাষা সৃষ্টির আগে মানুষ আকার, ইঙ্গিত, ইশারা, চিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করতো। কিন্তু আমরা যদি আল-কুরআন পর্যালোচনা করি, তা হলে দেখা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মানব জাতির সৃষ্টির বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, মানব জাতির সৃষ্টির পূর্বেই ভাষার সৃষ্টি ।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম তদীয় সন্তান হযরত শীষ আলাইহিস সালামকে শিক্ষাদান করেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর অনুসারীদের তুফানের বিষয়ে অবগত করান। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় বসবাস করেন। মক্কার ভাষা আরবি। সুতারাং সৃষ্টি সভ্যতার শুরু থেকেই আরবি-ভাষা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত ও বর্তমান

প্রাচীন আরবি-ভাষার রূপরেখায় আমরা যা দেখতে পাই, সব সেমিটিয় ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যঞ্জন-বর্ণ দিয়ে গঠিত ধাতুরূপ বা শব্দমূল। প্রকৃতি আরব ভূমিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছে। উত্তরে হেজাজ প্রদেশ, দক্ষিণে ইয়ামেন। তারাই ইয়ারুব ইবনে কাহতান এর বংশধর। মদিনার আউস ও খাজরাজ যারা আনসার নামে অভিহিত তারাও কাহতানি আরব। হিজাজী আরবগণ পূর্বকাল থেকেই যাযাবর জাতি। ইয়েমেনের বাসিন্দারা 'হিমিয়ারী' নামে পরিচিত। নামে মাত্র হিমিয়ারীগণের অধীনে থাকলেও হেজাজস্থ যাযাবর আরব জাতির স্বাধীনতা চিরকালই অক্ষুন্ন ছিল।

দক্ষিণ আরবের ভাষা খ্রিষ্ট্রীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আবিসিনিয়গণ কর্তৃক হিমিয়ারী সাম্রাজ্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এই সময় হতেই উত্তর আরবস্থ হেজাজী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। এ হেজাজীয় ভাষাই এযাবৎকাল আরবি-ভাষা নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

ভাষার উৎস মনের ভাব প্রকাশের প্রবল ইচ্ছা থেকেই। জীববিজ্ঞানের বিবর্তনের ইতিহাস এটা প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ভাষাসমূহের অন্যতম ভাষা হলো আরবি। যদিও আরবি-ভাষার উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে কেউ যথার্থ কোন প্রমাণাদি উপস্থাপনে সক্ষম হননি।

ডক্টর আলী আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফির মতে আরবি-ভাষা হিজাজ ও নজদ এলাকায় উৎপত্তি লাভ করে । আব্দুল মালিক ইবনে হাবীব-এর মতে- হযরত নূহ আলাইস সালাম-এর প্লাবনের পর জুরহুম নামক এক ব্যক্তি আরবী ভাষায় কথা বলেন।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা জানতে পারি যে, আরবি -ভাষায় সর্বপ্রথম কথা বলেছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় তিনি আরবি-ভাষা ভুলে যান। পরবর্তীতে তাঁর তওবা কবুল হলে তিনি পুনরায় আরবিভাষায় কথা বলেন। দীর্ঘদিন এ ভাষা প্রচলিত ছিল। কালের বিবর্তনে আরবি-ভাষা সুরানি বা সুরইয়ানি ভাষায় রূপান্তরিত হয়, যা আরবি-ভাষার বিকৃত রূপ । হযরত নুহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নৌকার সকল যাত্রী এই সুরইয়ানি ভাষায় কথা বলতেন। অন্য মতে, জুরহুম নামক ব্যক্তির ভাষা ছিল আরবি। তাঁর পূর্বপুরুষরাও আরবিভাষায় কথা বলতেন ।

অপরদিকে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামও আল্লাহ কর্তৃক আরবিভাষাপ্রাপ্ত হন। একটা পর্যায়ে জুরহুমের অধঃস্তন বংশধর বনু কাহতান হযরত ইসমাইল আলাইহিস সাল্লাম-এর বংশধরদের সাথে মিলিত হয়ে একত্রে বসবাস করে। তারা বনু ইসরাঈলের নিকট হতে আরবি-ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবে আল-কুরআন নাজিলের পূর্ব পর্যন্ত

আরবি-ভাষার ব্যবহার অব্যাহত থাকে। অদ্যাবধি আরবি প্রচলিত আছে, যা সেমিটিক ভাষাসমূহের মধ্যে একমাত্র জীবিত ভাষা।

পুরাতন আরবি

আরবি সম্পর্কিত অসংখ্য সেমিটিক ভাষা ত্রয়োদশ এবং দশম শতাব্দীর মধ্যে আরবে ব্যবহার হতো। কিন্তু এগুলোর এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা তাদের আরবি ভাষা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। 'আরব' হিসেবে উল্লেখ করা লোকদের প্রাচীনতম প্রমাণ খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর একটি অ্যাসিরিয়ান শিলালিপিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, এতে শুধু আরবদের কথা বলা হয়েছে। এটি তাদের ভাষার কোনো প্রমাণ দেয় না। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টাব্দ ৪র্থ শতাব্দীর মাঝে এমন কিছু শিলালিপি পাওয়া গেছে যা আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপের প্রমাণ দেয়। এই শিলালিপিগুলোর মধ্যে কিছু আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপ এবং অন্যগুলো আরামাইক ভাষায় লেখা, তবে এতে আরবির কিছু প্রভাব দেখা যায়। এই শিলালিপিগুলোতে বেশিরভাগই সাধারণ নাম, তাই এটাও আমাদের আরবি ভাষা সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য দেয় না।

আরবি ভাষার সম্ভাব্য প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মনে করা হয় জর্ডানের বায়ির এলাকায় প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমদিকের একটি শিলালিপিকে। অবশ্য এর ভাষা আরবি না অন্য কোনো সেমিটিক ভাষা তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। তবে, প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধের দিককার বহু শিলালিপি পাওয়া গেছে সিরিয়া, জর্ডান ও উত্তর পশ্চিম সৌদি আরবে। মূলত এই লিপিগুলোর উপর ভিত্তি করে এগুলোকে একটি উত্তরের শাখা (সাফাইটিক) ও একটি দক্ষিণের শাখায় (হিসমাইক) ভাগ করা হয়। এগুলোতে ব্যবহৃত লিপি পরবর্তীকালের আরবি লিপি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও তৎকালীন দক্ষিণ আরবে প্রচলিত লিপি থেকে উৎপন্ন। কিন্তু লিপি আলাদা হলেও এই লেখাগুলোর ভাষা বিবেচনা করে এগুলোকে আরবি ভাষারই প্রাচীন রূপ বলে নির্ণয় করেছেন ভাষাবিদরা। ঠিক একই সময়ে

আরব উপদ্বীপের অন্যান্য জায়গায় অন্যান্য লিপিতেও সেমিটিক ভাষায় আরও লেখা পাওয়া গেছে, কিন্তু সেগুলোর কোনোটাই পরবর্তী কালের আরবি ভাষার পূর্বসূরী ছিল না বলে মনে করেন পণ্ডিতরা। সেই হিসেবে দেখলে উত্তর-পশ্চিম আরব ও দক্ষিণ শাম (লেভান্ট বা Levant)-এ আরবি ভাষার প্রথম সহস্রাব্দের পূর্বপুরুষের দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

আরব ভূমিতে প্রধান রাজ্যগুলোর একটি ছিল নাবাতিয়ান রাজ্য। তাদের রাজধানী ছিল জর্ডানের পেট্রা নগরীতে, যা উত্তর আরবে অবস্থিত। তবে মজার ব্যাপার হলো, নাবাতিয়ান মানুষরা তখন আরবি ভাষা লিখত না। তাদের বাণিজ্যব্যবস্থা ছিল অন্যান্য দূরের রাজ্যগুলোতে। তাই যোগাযোগের জন্য ব্যবহার হতো সেই সময়ের মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান ভাষা আরামাইক। তবে স্থানীয় অধিবাসীরা মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই প্রাচীন আরবি ভাষায় কথা বলতেন। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নাবাতিয়ানদের মধ্যে প্রথম আরামাইক লিপির একটা টানা হাতের রূপভেদে আরবি ভাষা লিখতে দেখা গেল, যা আইন আভদাত (Ein Avdat) শিলালিপিতে দেখা যায়। এটিই প্রাচীনতম শিলালিপি, যেটি নিঃসন্দেহে আরবি ভাষার, যার সময় প্রায় ১২৫ খ্রিষ্টাব্দ। পাঠক, আপনারা নিচে যে ছবিটি দেখতে পারছেন, সেটিই আইন আভদাত শিলালিপি, যা বর্তমান ইসরাইলের দক্ষিণে নেগেভ মরুভূমির একটি গিরিপথ 'আইন আভদাত'-এ পাওয়া গেছে। এটি একটি আরামাইক শিলালিপি, তবে এতে আরবি ভাষার তিনটি লাইন রয়েছে।

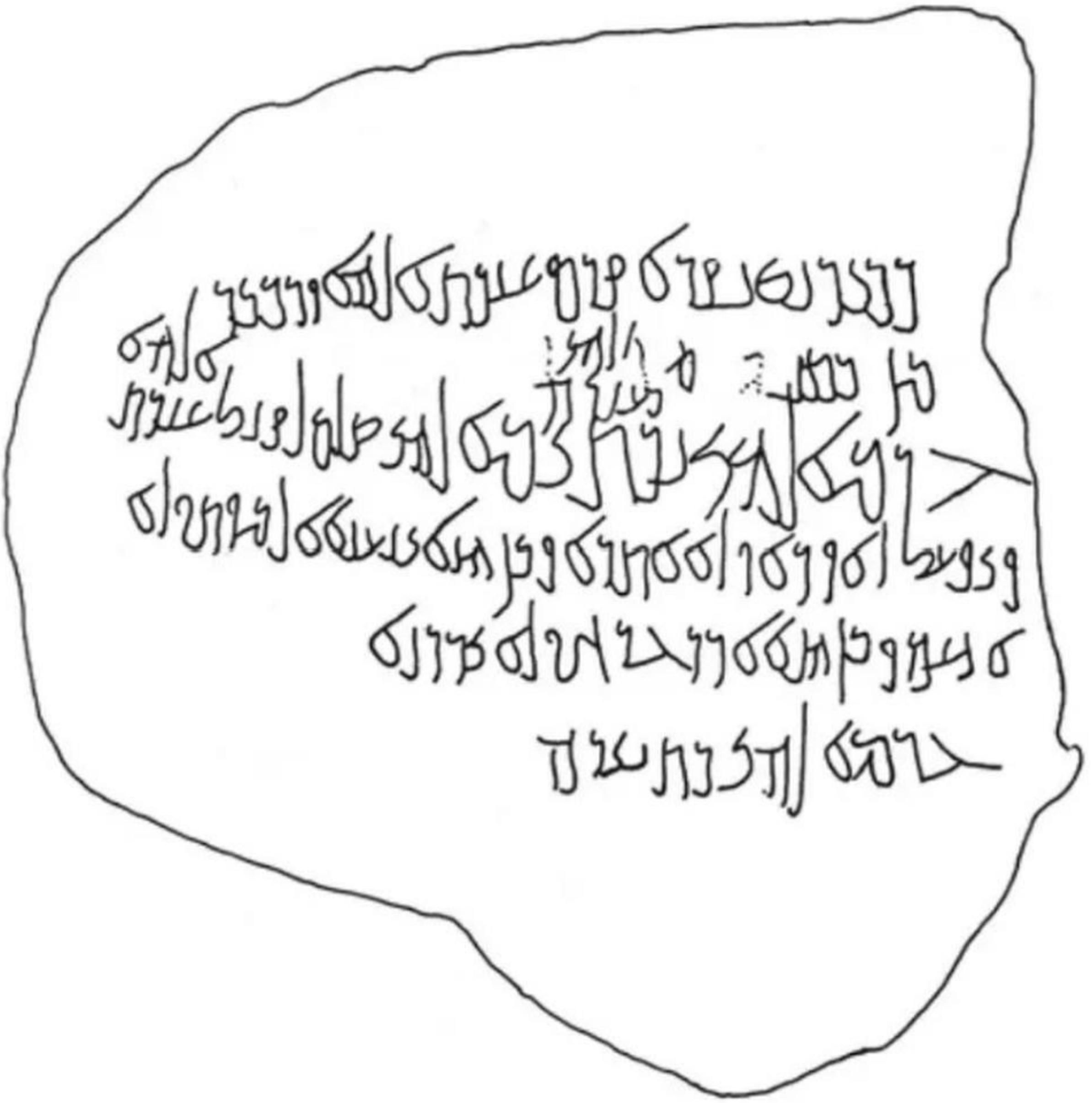

আইন আভদাতে পাওয়া আরবি ভাষার প্রাচীনতম শিলালিপি

তাদের বাণিজ্যপথের মাধ্যমে নাবাতিয়ান আরবি ভাষা ও এই রূপান্তরিত আরামাইক লিপি আরব উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে হিজাজ (বর্তমানে ইসলামের পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনা এই হিজাজ অঞ্চলে অবস্থিত) হয়ে ইয়েমেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। যা-ই হোক, প্রথমে নাবাতিয়ান বাণিজ্যের প্রভাবে এবং পরে ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে সারা আরব

উপদ্বীপেই ধীরে ধীরে আরবি ভাষা ছড়িয়ে পড়ে, এবং আগের প্রাচীন ভাষাগুলোর ব্যবহার কমতে কমতে এককালে হারিয়ে যায়। প্রধান ব্যতিক্রম থেকে যায় নাবাতিয়ান রাজ্য থেকে দূরতম প্রান্তে অবস্থিত ইয়েমেন ও ওমান সীমান্তে হাজরামাউত ও জুফার অঞ্চল, যেখানকার আঞ্চলিক ভাষা তখনও আরবি ছিল না।

৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কের ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে আন-নামারাতে আরেকটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। এই শিলালিপির ভাষাটি প্রায় শাস্ত্রীয় আরবির মতোই। যদিও এই শিলালিপিগুলো স্পষ্টতই আরবি ভাষায় লেখা, এগুলো আরবি লিপিতে লেখা নয়, বরং এটি নাবাতিয়ান লিপি, যা আরামাইক লিপি থেকে এসেছে। কিন্তু কিছু শিলালিপি খ্রিষ্টীয় ৪র্থ এবং ৫ম শতাব্দীরও রয়েছে, যেগুলো আরবি ভাষার মতো একটি লিপিতে লেখা। সাধারণত মনে করা হয় যে, আরবি লিপি নাবাতিয়ান লিপি থেকে বিকশিত হয়েছে, এবং এই শিলালিপিগুলো একটি স্ক্রিপ্ট বা লিপিতে লেখা হতে পারে যেটি এই দুটির মধ্যে হতে পারে। এই শিলালিপিগুলো মূলত উত্তর আরবের ছিল।

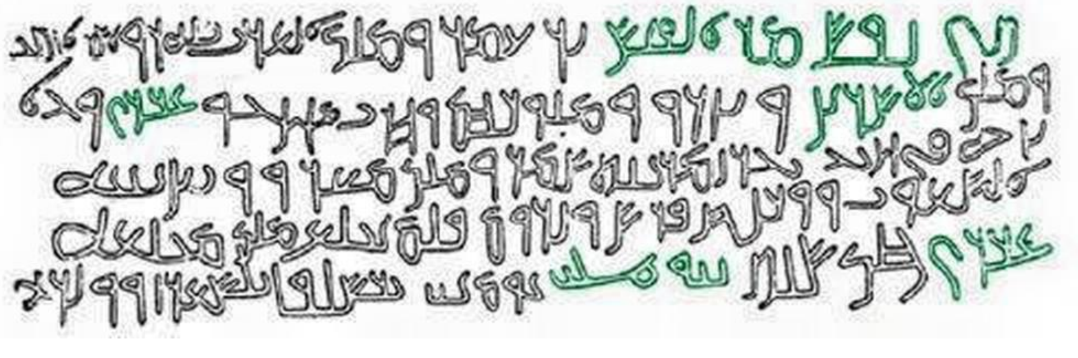

পুরাতন আরবির একটি নিদর্শন 'আন-নামারা' শিলালিপি

অন্যদিকে, দক্ষিণ আরবীয়রা তাদের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়কে লিপিবদ্ধ করার জন্য যে ধরনের উপাদান ব্যবহার করত, তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ধরনের শিলালিপির প্রাচীনতম নিদর্শনগুলোর বয়স খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম ও নবম শতক। এই লিপিগুলো লেখা হতো একবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, পরের লাইন ডান থেকে বাঁ দিকে। এই লিপিগুলো থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ আরবীয় বা মিনীয়-সাবিয়ান ভাষার (হিময়ারাইট নামেও পরিচিত) বর্ণমালাতে ২৯টি অক্ষর ছিল যা আধুনিক আরবি বর্ণমালাতেও দেখা যায়। বর্ণগুলোর আকার ছিল অনেকটা কাঁটাওয়ালা আঁকশি বা কুড়ুলের মতো। এগুলো এসেছিল সিনিয় বর্ণমালা থেকে, যেটি আবার ফিনিশিয় ও মিশরীয় বর্ণমালার পূর্বসূরির মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তুলেছিল। এই সমস্ত সুসামঞ্জস্য অক্ষরগুলো একটি দীর্ঘ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

অন্যান্য সেমিটিয় বর্ণমালার মতো এর বর্ণমালাতেও কেবলমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণেরই অস্তিত্ব ছিল। বিশেষ্য পদ গঠনে, ক্রিয়ার ধাতুরূপ, ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ও শব্দভাণ্ডারের বেশ কিছু ক্ষেত্রে আক্কাদিয়ান (অ্যাসিরো-ব্যাবিলনিয়ান) ও ইথিওপীয় ভাষার সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় ভাষার মিল লক্ষ্য করা যায়। আবার, এই ভাষার মধ্যে ভাঙা-ভাঙা বহুবচন লক্ষ্য করা যায় যা উত্তর আরবীয় ও ইথিওপীয় ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করে। আক্কাদিয়ান, দক্ষিণ আরবীয় ও ইথিওপীয় ভাষা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরনো সেমিটিক ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করেছে। ইয়েমেন সংস্কৃতি ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় ভাষার বিলুপ্তি ঘটে, আর এই স্থান দখল করে নেয় উত্তর আরবীয় ভাষা। উত্তর আরবে 'উকাজ'-এর মতো সাহিত্য মেলা, কাবায় বার্ষিক হজ্বযাত্রা ও মক্কার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

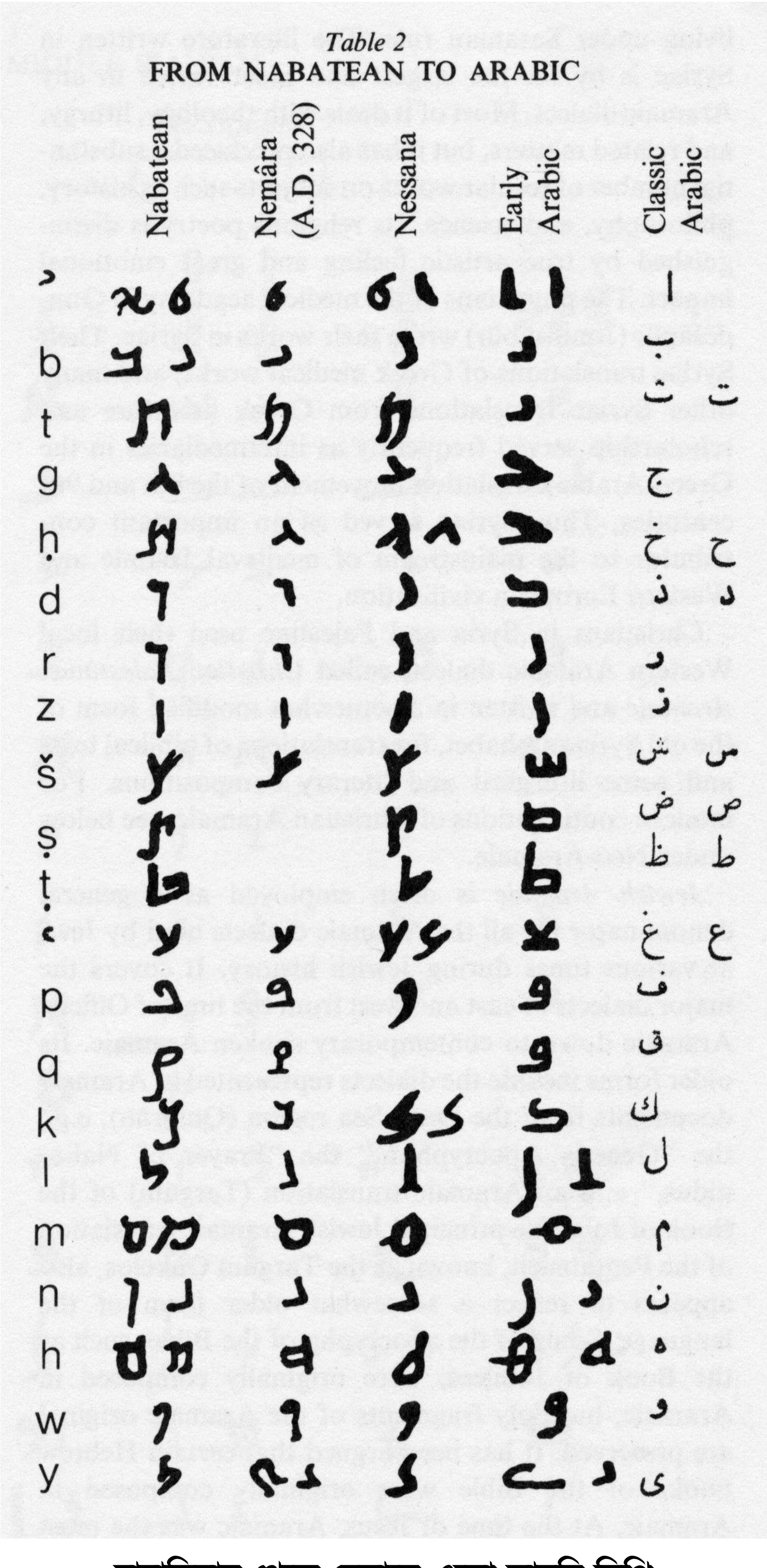

নাবাতিয়ান থেকে যেভাবে এলো আরবি লিপি

আরবী ভাষার ক্রমবিকাশ

আরবি-ভাষার ক্রমবিকাশকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি :

জাহেলী যুগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব বা নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্ব সময়কে 'আল-আসরুল জাহেলিয়াহ অর্থাৎ অজ্ঞতা ও অন্ধকারের যুগ নামে অভিহিত করা হয়। এ সময় পুত্তলিকতা ও অংশীবাদ ধারণায় তারা আচ্ছন্ন ছিল। স্বভাবজাতভাবেই তারা ছিল তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তাদের মধ্যে সাহিত্য চর্চা হতো। সাহিত্য চর্চা নিয়ে মেলা হতো। ওকাজ মেলায় সাহিত্য আসরে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ কাবাঘরে ঝুলিয়ে দেয়া হতো। শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতার জন্য পুরস্কৃত করা হতো। বংশীয় বা গোত্রীয় লোকজন এতে অহংকার প্রকাশ করত। তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে-এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

তাদের কবিতায় আরবি-ভাষার সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে। চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় আরবি-ভাষা তার গতি প্রকৃতি ছড়িয়েছে। তৎকালীন বিখ্যাত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— ইমরুল কায়েস, আনতারা বিন সাদ্দাদ, কা'ব বিন যুহাইর, যুহাইর বিন আবি সালমা, আশা বাউনিয়া, লাবিদ বিন রাবিয়া প্রমূখ ।

ইসলামী যুগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়্যত প্রাপ্তির পরবর্তী সময়কে ইসলামী যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর নিকট সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন বিধান 'আল-

কুরআন’ নাজিল হলে আরবি ভাষার সমৃদ্ধি ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায় ও মর্যাদার আসন অলংকৃত করে। আরবি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার, ছন্দ, অলংকার সকল শাখায় পূর্ণতা লাভ করে।

আরবি ভাষার বিকাশে নতুন যুগের সূচনা ঘটে। যদিও এ সময় আরবি ভাষা লিখতে জানতেন মোট ১১ জন ব্যক্তি। তন্মধ্যে আবু সুফিয়ান-এর পরিবারেরই ছিলেন ৪ জন। উল্লেখ্য, বদর যুদ্ধে কাফেরদের মুক্তির শর্ত ছিল একজন কাফের দশ জন মুসলমানকে লেখা শেখাবেন অর্থাৎ সে সময় আরবি শেখারও প্রচলন ছিল।

অনেকের মতে, আরবি ভাষার সর্বপ্রথম লেখক হলেন ‘আম্বার’-এর অধিবাসী ‘মুররা বিন্ মুররা’ এবং ‘আসলাম বিন্ হাফরাহ্’’। কারো মতে ‘হার্ব বিন উমাইয়া বিন্ আবদে শাম্স্ । তিনি ‘হিরারত অধিবাসীদের কাছ থেকে শিখেছেন। হিরার অধিবাসীরা ‘আম্বার’-এর কাছ থেকে শিখেছেন। এ সময় আরবি লেখনীতে কোন নক্‌তা বা হরকত ব্যবহৃত হতো না ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়কালে ব্যাপক আকারে মুসলিমদের মধ্যে আল-কুরআন ও আল-হাদিস চর্চার ফলে আরবি ভাষা উৎকর্ষ অর্জন করে। বিখ্যাত কবি লাবিদ বিন্ রাবিয়া মন্তব্য করেন-

“আমার কাছে যেহেতু আল-কুরআন আছে; সুতরাং আর কোন কবিতা রচনার প্রয়োজন নেই”।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর বৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্যে ব্যাপকভাবে ধর্মীয় চর্চা শুরু হলেও আঞ্চলিকতার কারণে আল-কুরআন পঠনে পদ্ধতিগত সমস্যা তৈরি হয়। হিজরি প্রথম শতাব্দিতে আরবি ভাষা নোক্তা বা নক্তা ছাড়াই লেখা হতো ।

জনৈক অনারব সুরা তাওবার ৩ নম্বর আয়াতে ! jiss italini o II পাঠ করছিলেন।উক্ত আয়াতে রাসূলুহু শব্দের লাম-কে যের দিয়ে পড়লে জনৈক সাহাবী বিষয়টি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিগোচরে আনেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাষার শুদ্ধতা ও আল-কুরআনকে বিশুদ্ধ রূপে পঠনে সে সময়ের পণ্ডিত আবুল আসওয়াদ আদ্-দুয়ায়েলীকে সমস্যা নিরসনের দায়িত্ব দেন। তিনি বিভিন্ন বর্ণকে আলাদাভাবে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ফোঁটা (নক্তা) এবং যবর, যের, পেশ, সাকিন তাশদীদ বুঝানোর জন্য বিশেষ চিহ্ন (হরকত) ব্যবহার করেন।

উমাইয়া যুগ

এই সময়ে নোকতার ব্যবহার শুধুমাত্র আল-কুরআন পাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে মুসলিম সাম্রাজ্য সুদূর ইউরোপ-আফ্রিকা ছড়িয়ে পড়ে। আর দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে আরবিকে ঘোষণা করলে-এর প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়। দাপ্তরিক ভাষা হওয়ার কারণে আরবি ভাষাকে সর্বজনগ্রাহ্য করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

হিজরি দ্বিতীয় শতকে ‘খলিল বিন্ আহ্মাদ’ অন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। তিনি ফোঁটা বা নোকতার পরিবর্তে যবর বুঝানোর জন্য বর্ণের উপর বাঁকা ছোট্ট আলিফ, যের বুঝানোর জন্য বর্ণের নিচে ছোট্ট ইয়া দিলেন এবং পেশ বুঝানোর জন্য বর্ণের উপর ছোট্ট ওয়াও দিলেন। তানবিন বুঝানোর জন্য ছোট্ট করে দুইবার টান দিলেন। অতঃপর এই প্রক্রিয়া খলিফা ‘আব্দুল মালিক বিন্ মারওয়ান’-এর আমলে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

আরব সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে সিরিয়া প্রথম দেশ, যাদের ভাষা হয়ে যায় আরবি। এ সময় আরবি বর্ণমালা বিন্যাস করেন বিন্ আছিম আল লাইছি, ইয়াহয়া বিন ইয়ামুর আল

আদওয়ানি। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে ‘হাজ্জাজ বিন্ ইফসুফ’-এর নির্দেশে হরকত সংযোজিত হলে আরবি লেখনি পূর্ণতা অর্জন করে। সেই পদ্ধতি আজও বিদ্যমান।

আব্বাসী যুগ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ ছিল এটি। ব্যাপক আরবি ভাষা চর্চা ছাড়াও গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার লিখিত অনেক বিখ্যাত ও মূল্যবান পুস্তক আরবিতে অনূদিত হয়। এ সময় পণ্ডিতরা বিশেষ পরিভাষাগুলো আরবি করার প্রয়াস পান। যাতে করে শব্দগুলো উৎপত্তিগতভাবে আরবিতে ব্যবহৃত হতে পারে। এ সময়কালের শুরুতেই আরবি ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য লেখার কাজ শুরু হয়। ফলে আরবি ভাষা বই-পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার স্তরে পৌঁছে। আরবি ব্যাকরণ, নাহু, সরফ, ধ্বনি বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান, অলঙ্কারশাস্ত্র, অভিধানগত বইয়ের প্রকাশ ঘটে। এভাবে আরবি ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বর্তমান সময়ের মুসহাফ এবং প্রাচীনকালের মুসহাফ

আধুনিক যুগ

সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে আরবি ভাষা তেজোদ্দীপ্ত,যা আজ সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই আরবি ভাষার কদর। ব্যবসায়িক বাজার দখল করার জন্য আরবী ভাষার সমৃদ্ধিও পরোক্ষভাবে অর্জিত হয়। আরব ভূমি ছাড়াও এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় আরবি ভাষার যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আরব প্রতিভা জগতকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করার নিমিত্তে ব্যস্ত। বিশেষ করে সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা চরম উৎকর্ষ লাভ করে ।

মিসরীয় কথা সাহিত্যিক ‘নাজিব মাহফুজ’ আরবি ভাষায় তার ‘ত্রয়ী’ উপন্যাসের জন্য **১৯৮৯** সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। তার রচনাগুলোও আরবি ভাষাতেই ছিল। আরবি ভাষার বিকাশ ও উত্থান বর্তমানে আরও বেগবান।

আরবি শব্দ ভাণ্ডারের মণি-মুক্তায় তার উজ্জ্বলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবি ভাষার রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন। আমরা জানি, আল্লাহ তাঁর জন্য আরবি ভাষাকে নির্বাচিত করেছেন। এছাড়াও আল-কুরআন, আল-হাদিস ও রাসূল সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর ভাষাও আরবি। মুসলিম হিসেবে বিশ্বাস করি, পরকালের ভাষাও হবে আরবি। আরবি ভাষা **১** কোটি **২০** লক্ষ শব্দ ভাণ্ডার নিয়ে পৃথিবীর সকল ভাষা জগতে স্বমহিমায় বিকশিত হচ্ছে । পৃথিবীর একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষাও আরবি ভাষা।

ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী আরবি

আরবে ইসলাম আগমনের আগে, উপদ্বীপের চারপাশে আরবি ভাষার অসংখ্য উপভাষা প্রচলিত ছিল। তবে ‘কোইন’ নামে একটি সাধারণ সাহিত্যিক ভাষাও ছিল কবিতার জন্য, যা বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ব্যবহৃত হতো। সাহিত্যিক ভাষা কোইনে লেখা কবিতার অংশগুলো ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী আরবি ভাষার প্রাচীনতম উদাহরণ। ধ্রুপদী আরবি সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো ‘মুআল্লকাত’ নামক কবিতা সংকলন। আরব পণ্ডিতদের মতে, ইসলামি যুগের আগে তদানীন্তন প্রাক-ইসলামি কবিদের লেখা সেরা সাতটি দীর্ঘ কবিতা সংগ্রহ করে একে একত্রে সংকলন করা হয়। এই প্রাক-ইসলামি কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ইমরুল-কায়েস, যিনি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। পরবর্তী যুগে আরবি ব্যাকরণবিদরা যে ভাষাকে ‘আরাবিয়্যা’ নাম দিয়ে প্রমিত আরবি হিসেবে গ্রহণ করেন, তার প্রথম নিদর্শন এই কবিতাগুলো। কুরআন পাঠে যে আরবি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ ব্যবহার হয়, সেটিও এই প্রমিত আরবির উদাহরণ।

তাই বলা যায়, ধ্রুপদী আরবি, যেটি ৬ষ্ঠ শতক থেকে প্রচলিত হয়, সেটাতেই পবিত্র কুরআন লেখা হয়েছে। কুরআন লেখার সময় ধ্রুপদী আরবি ভাষার সাতটি উপভাষা ছিল, যার সবকটিতেই কুরআন লেখা হয়েছিল। কিন্তু কুরাইশ সংস্করণটি সেই মানদণ্ড হয়ে উঠেছে, যার উপর ভিত্তি করে আজকের কুরআন পঠিত হয়। পার্থক্যগুলো উচ্চারণে; শব্দভান্ডার বা ব্যাকরণে নয়। কুরআনের আরবি প্রাক-ইসলামিক ধ্রুপদী আরবি কবিতার অনুরূপ, তবে সম্পূর্ণভাবে নয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের শুরু থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত, ইসলামি সাম্রাজ্যের বিজয় আরবি ভাষাকে নতুন নতুন দূরবর্তী দেশে ছড়িয়ে দেয়। ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পর আরবি ভাষাকে মানসম্মত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কারণ, বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ভাষা ব্যবহার শুরু করেছিল। যার কারণে একে আরও ব্যবহারিক করা হয়, নতুন শব্দভাণ্ডার তৈরি করা হয়, এবং গদ্যের ব্যাকরণ ও গদ্যশৈলী প্রমিত করা হয়।

সব সেমিটিক ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাঞ্জনবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দমূল। সাধারণত তিনটি ব্যাঞ্জনবর্ণ নিয়ে গঠিত হয় একটি মূল শব্দ, যাদের একটি মূল অর্থ থাকে। তারপর স্বরবর্ণ যোগ করে বা উপসর্গ, মধ্যসর্গ আর অন্তঃপ্রত্যয় বসিয়ে এই মূলকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করে বিভিন্ন কাছাকাছি অর্থের শব্দ তৈরি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ আরবি 'সালিম' মূলটি দেখা যাক। এর অর্থ 'নিরাপদ'। মূল শব্দের সাথে স্বরবর্ণ বা উপসর্গ, মধ্যসর্গ আর অন্তঃপ্রত্যয় যোগ করে আমরা পাই: সালামুন (যার অর্থ শান্তি), মুসলিমুন (যার অর্থ মুসলিম)। আবার 'কিতাব' দেখি, যার অর্থ 'বই'। এ থেকে পেলাম কুতুবি (যার অর্থ বই বিক্রেতা), মক্তব (যার অর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়)। আর এভাবেই আরবি ভাষার বিভিন্ন শব্দভাণ্ডার তৈরি হয়েছে।

নিউ-আরবি এবং মধ্য আরবি

যখন লিখিত ভাষা হিসেবে ধ্রুপদী আরবি প্রমিত হচ্ছে, আরব সাম্রাজ্যের শহরগুলোতে আরবি ভাষার স্থানীয় উপভাষাগুলোও আবির্ভূত হয়। এই উপভাষাগুলো সরাসরি ধ্রুপদী আরবি থেকে আসেনি, বরং প্রাক-ইসলামিক আরবি উপভাষা 'কোইন' থেকে এসেছে। লেভান্ট এবং মেসোপটেমিয়ার উপভাষাগুলো আরামাইক দ্বারা, মাগরেবের উপভাষাগুলো বারবার (Berber) দ্বারা, মিশরের উপভাষাগুলো কপ্টিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই নতুন উদীয়মান উপভাষাগুলোর প্রথম শতাব্দীকে নিও বা নব্য-আরবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যদিও ধ্রুপদী আরবি প্রমিত ছিল, সবাই এটি নিখুঁতভাবে লিখতে পারত না। ক্লাসিক্যাল আরবি এবং নব্য-আরবি বা এর উপভাষা উভয়ের বৈশিষ্ট্য ধারণ করা লেখাকে মিডল বা মধ্য আরবি ভাষা বলা হয়। 'মিডল' কোন সময়কে বোঝায় না, বরং এই আরবি ক্লাসিক্যাল এবং নব্য-আরবির কথোপকথনের মধ্যবর্তী ভাষা ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিও আরবি উপভাষাটি (যেটি আধুনিক) আধুনিক আরবিসহ কথোপকথন উপভাষায় বিকশিত হতে থাকে, কিন্তু সাহিত্যিক আরবি তুলনামূলকভাবে স্থির ছিল, কারণ কুরআনের আরবিকে সর্বদাই আদর্শ হিসেবে দেখা হতো। আদর্শ আরবি অনুসরণ করার জন্য এটি সম্ভবত উপভাষার উপর রক্ষণশীল প্রভাব ফেলেছিল, এবং এই কারণে নেপোলিয়ন মিশরে প্রবেশের পরেও তাদের মধ্যে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি।

মধ্যযুগের প্রথমদিকে আরবি ভাষা ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সংস্কৃতির প্রধান বাহন। এটি বিশেষ করে বিজ্ঞান, গণিত এবং দর্শনে বহুল ব্যবহৃত হতো। ফলে ইউরোপের দেশগুলোর অনেক ভাষাও আরবি থেকে প্রচুর শব্দ ধার করেছে। ইউরোপের খ্রিস্টান ও আরবের মুসলিম সভ্যতার নৈকট্য এবং দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম সংস্কৃতি ও আরবি ভাষার উপস্থিতির কারণে স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, কাতালান এবং সিসিলিয়ান শব্দভাণ্ডারে আরবি শব্দ দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, 'আলজেবরা' বা 'বীজগণিত' আরবি শব্দ 'আল-জাবর' থেকে এসেছে। মাল্টিজ বা মাল্টার ভাষা হলো একটি সেমিটিক ভাষা, যা আরবি ভাষার একটি উপভাষা থেকে এসেছে এবং এটি ল্যাটিন বর্ণমালায় লেখা হয়। গ্রীক এবং বুলগেরিয়ানসহ

বলকান রাষ্ট্রের ভাষাগুলোও অটোমান তুর্কিদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আরবি ভাষার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শব্দ অর্জন করেছে।

১৭৯৮ সালে আরব বিশ্ব প্রথমবারের মতো পশ্চিমা বিশ্বের সাথে যোগাযোগের বৃহত্তর যুগে প্রবেশ করে এবং নতুন পশ্চিমা ধারণাগুলো প্রবাহের জন্য আরবি ভাষাকে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিকায়ন করার প্রয়োজনিয়তা অনুভব করে। ফলশ্রুতিতে আরবি ভাষার আঞ্চলিক একাডেমিগুলো ভাষার একটি সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করে। সংস্কার প্রক্রিয়াটি প্রধানত ভাষার শব্দভান্ডার সম্প্রসারণ এবং ভাষাকে আধুনিক করা নিয়ে ব্যাপক কাজ করে। সংস্কার প্রক্রিয়ার পর আরবি ভাষা আধুনিক স্ট্যান্ডার্ড আরবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

বিশ্বজুড়ে আরবি ভাষা অন্যান্য অনেক ভাষাকে প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে মুসলিম সংস্কৃতি এবং মুসলিমরা যেসব দেশ জয় করেছিল সেগুলোর ভাষাকে। সর্বাধিক প্রভাবিত ভাষার মধ্যে কয়েকটি হলো ফার্সি, তুর্কি, হিন্দি, উর্দু, কাশ্মীরি, কুর্দি, বসনিয়ান, কাজাখ, বাংলা, মালয় (ইন্দোনেশিয়ান এবং মালয়েশিয়ান), মালদ্বীপ, পশতু, পাঞ্জাবি, আলবেনিয়ান, আর্মেনিয়ান, আজারবাইজানীয়, সিসিলিয়ান, স্প্যানিশ , গ্রীক, বুলগেরিয়ান, তাগালগ, সিন্ধি, ওড়িয়া, হিব্রু, হাউসা, এবং আফ্রিকার কিছু কিছু ভাষা, যেমন: সোয়াহিলি, সোমালি। বিপরীতে, অন্যান্য ভাষা থেকেও আরবি ভাষায় শব্দ এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে আরামাইক, হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক, ফার্সি এবং কিছুটা তুর্কি (উসমানী সাম্রাজ্যের কারণে), ইংরেজি এবং ফরাসি (লেভান্টে তাদের উপনিবেশের কারণে) এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষা, যেমন- আবিসিনিয়ান।

আরবি বর্ণমালা লেখা হয় ডান দিক থেকে বাম দিকে। এই বর্ণমালাগুলো নাবাতিয়ানের মাধ্যমে আরামাইক থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সাধারণ লেখার পাশাপাশি আরবি বর্ণমালার অনেকগুলো লিখনশৈলী বিকশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ও সুন্দর একটি লিখন পদ্ধতি হলো আরবি ক্যালিগ্রাফি। পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য বই লেখার জন্য, এবং মসজিদ,

মাজার বা ইসলামের স্মৃতিসৌধের শিলালিপিগুলোর সজ্জা হিসেবে আরবি ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার দেখা যায়। এই ক্যালিগ্রাফিগুলো কুরআনের একটি আয়াত বা একটি হাদিস বা আরবিতে লেখা যেকোনো বিমূর্ত আর্ট বা শৈল্পিক নকশা হতে পারে। ক্যালিগ্রাফিগুলো বেশ মনোমুগ্ধকর হয় বলে বিভিন্ন ডিজাইন হিসেবে এগুলোর ব্যবহার চোখে পড়ে। সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে এসব ক্যালিগ্রাফির বিশ্বজোড়া ব্যাপক কদর রয়েছে।

ইলমুল দবত (কুরআনের হরফ এবং হরকতের ক্রমবিকাশ)

রাসুলুল্লাহ সা. এর যুগে কুরআনে কোনো নুকতা, হারকাহ এবং হামযাহ ছিল না। আরবদের এর প্রয়োজন হয়নি কারন তারা এভাবে পড়েই অভ্যস্ত ছিলেন।

কিভাবে নুকতা আসলো:
যখন নন আরবরা ইসলাম গ্রহন শুরু করল তখন বিভিন্ন স্কলার্সরা নুকতাযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সর্বপ্রথম আব্দুল আসওয়াদ আদ দুয়ালি ৬৯ হিজরিতে নুকতাযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

হারকাহ এর নুকতা (৬৯ হিজরিতে আব্দুল আসওয়াদ আদ দুয়ালি):
ফাতহাহ এর আলামাত হারফের উপরে একটা নুকতা।
কাসরহ এর আলামাত হারফের নীচে নুকতা।
দ্বম্মাহ এর আলামাত হারফের পাশে নুকতা।

•আল- মুহকাম ফি নাক্বতাল মাসাহিফ (المحكم في نقط المصاحف) কিতাবে ইমাম আবু আমর আদ দানি বলেছেন: আব্দুল ক্বইস গোত্র থেকে আবুল আসওয়াদ একজন লোককে ডাকলেন এবং বললেন: কুরআনের একটি কপি নাও এবং তা কালি দিয়ে রং করো অর্থাৎ নুকতা দাও। আমি যখন মুখ খুলবো তখন হারফের উপরে একটা নুকতা, যখন গোল

করব তখন হারফের পাশে একটা নুকতা এবং যখন নীচের দিকে করব তখন নীচে নুকতা দিবে। আর যখন এগুলো গুন্নাহর সাথে উচ্চারন করি তখন তানউইন দিবে।

৯০ হিজরিতে নাশার বিন আসিন হারফের নুকতা দিয়েছেন। তিনি নুকতার জায়গায় একটু বাকানো ডেশ ব্যবহার করেছেন।

হারফসমূহের ক্রমবিকাশ

نَقْطُ الإعجام

• فنقَطَ نصرُ بنُ عاصم الباءَ بواحدةٍ من تحتُ (ب) .
والتاءَ باثنتَين من فوقُ (ت) .
والثاءَ بثلاثٍ من فوقُ (ث) .
ونقَطَ النونَ والياءَ – غيرَ المتطرِّفتَين – بواحدةٍ للنونِ من فوقُ (نـ) وباثنتَين للياءِ من تحتُ (يـ) لاشتباهِهما بهِنَّ .
• ونقَطَ الجيمَ بواحدةٍ من تحتُ (ج) .
والخاءَ بواحدةٍ من فوقُ (خ) .
وتركَ الحاءَ مُهملةً لزوالِ الاشتباه (ح) .

٥٢٤

نَقْطُ الإعجام

• ونقَطَ الذالَ بواحدةٍ من فوقُ (ذ) وتركَ الدالَ (د) .
• ونقَطَ الزايَ بواحدةٍ من فوقُ (ز) وتركَ الراءَ (ر) .
• ونقَطَ الشينَ بثلاثٍ من فوقُ (ش) وتركَ السينَ (س) .
• ونقَطَ الضادَ بواحدةٍ من فوقُ (ض) وتركَ الصادَ (ص) .
• ونقَطَ الظاءَ بواحدةٍ من فوقُ (ظ) وتركَ الطاءَ (ط) .
• ونقَطَ الغينَ بواحدةٍ من فوقُ (غ) وتركَ العينَ (ع) .

٥٢٥

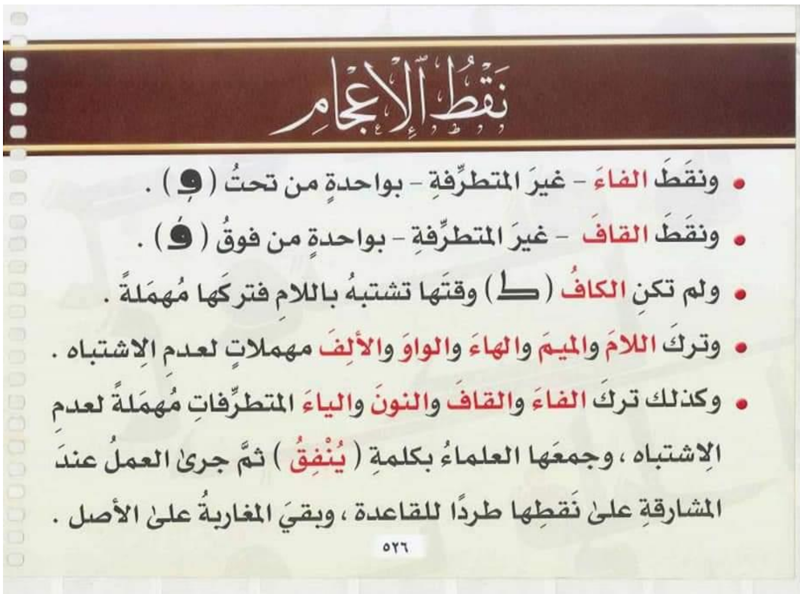

نَقْطُ الإعجام

- ونقَطَ الفاءَ - غيرَ المتطرِّفةِ - بواحدةٍ من تحتُ (ڢ) .
- ونقَطَ القافَ - غيرَ المتطرِّفةِ - بواحدةٍ من فوقُ (ڧ) .
- ولم تكنِ الكافُ (ك) وقتَها تشتبهُ باللامِ فتركَها مُهمَلةً .
- وتركَ اللامَ والميمَ والهاءَ والواوَ والألِفَ مهملاتٍ لعدمِ الاشتباه .
- وكذلك تركَ الفاءَ والقافَ والنونَ والياءَ المتطرِّفاتِ مُهمَلةً لعدمِ الاشتباه ، وجمعَها العلماءُ بكلمةِ (يُنْفِقُ) ثمَّ جرىٰ العملُ عندَ المشارقةِ علىٰ نَقطِها طردًا للقاعدة ، وبقيَ المغاربةُ علىٰ الأصل .

٥٢٦

কিছু হারফকে নুকতাবিহীন রাখা হয়েছে কারন এগুলোর মতো আর অন্য কোনো হারফ নেয়। যেমন: م ، ه ، ع ، و.

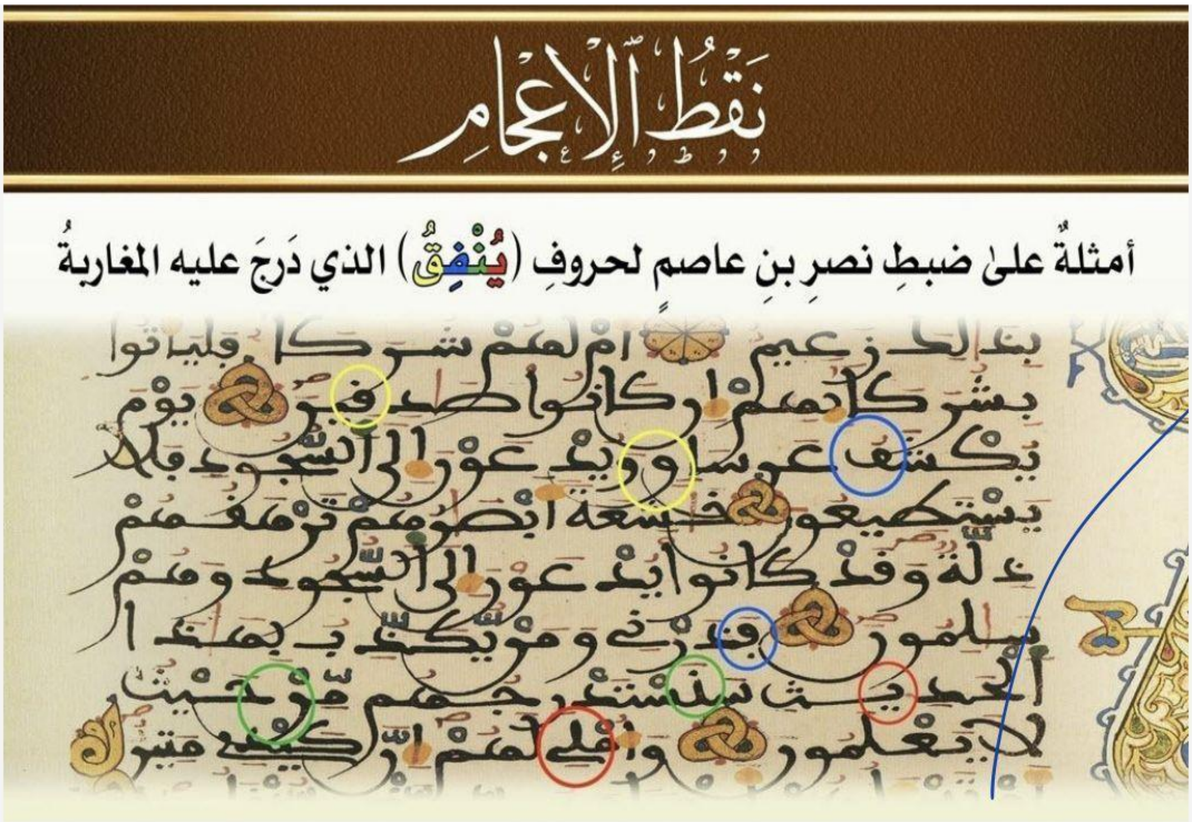

হারফ س এবং ش কে যেভাবে আলাদা করা হয়েছে:

تطوُّر نقط الشّين
مُيِّزتِ الشينُ عنِ السينِ بوَضْعِ نُقطةٍ
فوقَ كلِّ سنٍّ من أسنانِها .
ثُمَّ طوَّر الخطّاطونَ النِّقاطَ الثلاثَ
إلىٰ شكلِها الهَرميِّ كما نَراهُ اليوم .
س ش

হারফ ل এবং ك কে যেভাবে আলাদা করা হয়েছে:

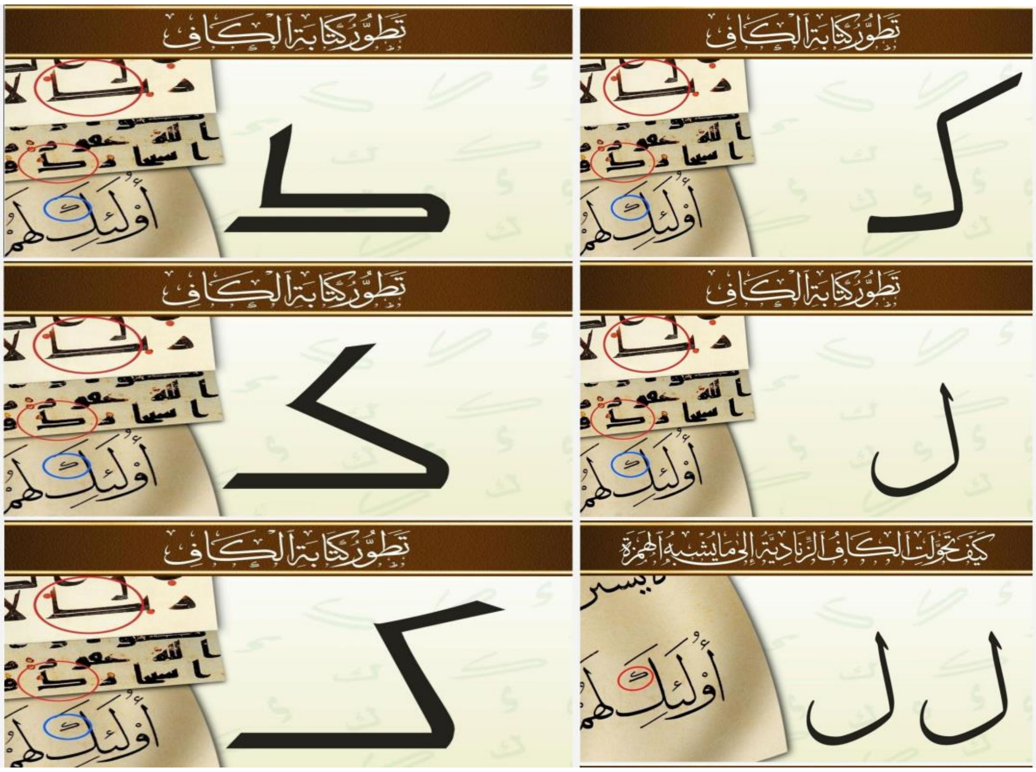

হামযাহ এর স্টেজ :

➔ খালি আলিফ লেখা হতো:

➔ হামযাহ এর আকার নেয়া হয়েছে আইনের মাথা থেকে। কেননা এদের মাখরাজ এবং উচ্চারন কাছাকাছি।

➔ ১৭৫ হিজরিতে আল খলিল ইবনে আহমাদ আল ফারহিদি হামযাহ এর আকার দিয়েছেন।

হারফ ص ض ط ظ এর স্টেজ:

➔ প্রথমে ইত্ববাক্বের এই চারটি হারফ একই রকম ছিলো:

এরপর ط ظ এর উপরে একটা মাথা দিয়েছে:

➔ এরপর ض ص কে আলাদা করার জন্য ض এ একটা নুকতা এবং ظ ط কে আলাদা করার জন্য ظ এর উপর একটা নুকতা দেয়া হয়েছে:

হরকতের ক্রমবিকাশ

১৭৫ হিজরিতে খলিল ইবনে আহমাদ আল ফারহিদি হরকতের আকার দিয়েছেন।

ফাতহাহ

تطوّر شكل علامات الإعراب
طوَّرَ الخليلُ بنُ أحمدَ الفراهيديُّ (ت ١٧٥ هـ) نقطَ
أبي الأَسودِ الدؤليِّ فجعلَ علامةَ الفتحةِ ألفًا مبطوحةً
فوقَ الحرفِ المفتوح .
وعلامةَ الضمةِ واوًا صغيرةً فوقَ الحرفِ المضموم .

দম্মাহ

تطوّر شكل علامات الإعراب
طوَّرَ الخليلُ بنُ أحمدَ الفراهيديُّ (ت ١٧٥ هـ) نقطَ
أبي الأَسودِ الدؤليِّ فجعلَ علامةَ الفتحةِ ألفًا مبطوحةً
فوقَ الحرفِ المفتوح .
وعلامةَ الضمةِ واوًا صغيرةً فوقَ الحرفِ المضموم .
و

تطوّر شكل علامات الإعراب
طوَّرَ الخليلُ بنُ أحمدَ الفراهيديُّ (ت ١٧٥ هـ) نقطَ
أبي الأَسودِ الدؤليِّ فجعلَ علامةَ الفتحةِ ألفًا مبطوحةً
فوقَ الحرفِ المفتوح .
وعلامةَ الضمةِ واوًا صغيرةً فوقَ الحرفِ المضموم .

কাসরহ

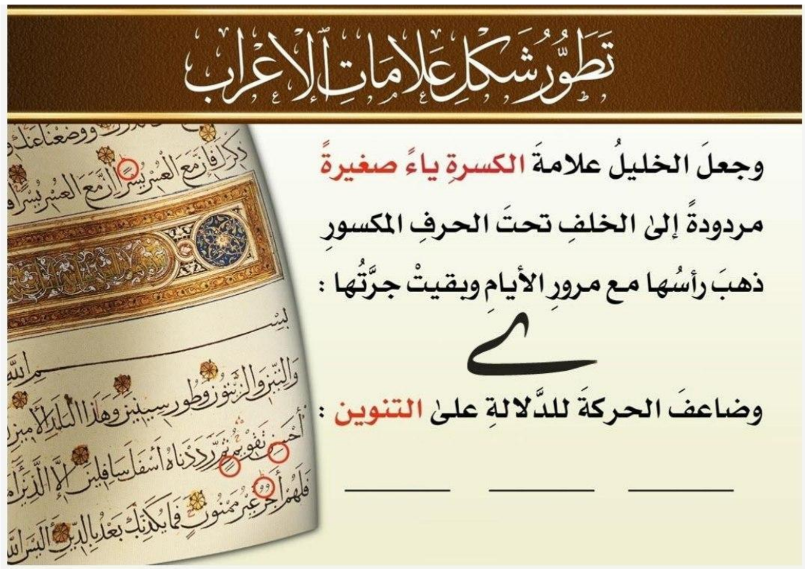
تطوّر شكل علامات الإعراب
وجعلَ الخليلُ علامةَ الكسرةِ ياءً صغيرةً
مردودةً إلى الخلفِ تحتَ الحرفِ المكسورِ
ذهبَ رأسُها مع مرورِ الأيامِ وبقيتْ جرَّتُها :
وضاعفَ الحركةَ للدَّلالةِ على التنوين :

تطوّر شكل علامات الإعراب

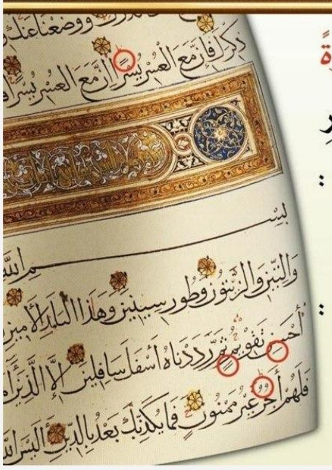

وجعلَ الخليلُ علامةَ الكسرةِ ياءً صغيرةً
مردودةً إلى الخلفِ تحتَ الحرفِ المكسورِ
ذهبَ رأسُها مع مرورِ الأيامِ وبقيتْ جرَّتُها :

وضاعفَ الحركةَ للدَّلالةِ على التنوين :

_______ _______ _______

تطوّر شكل علامات الإعراب

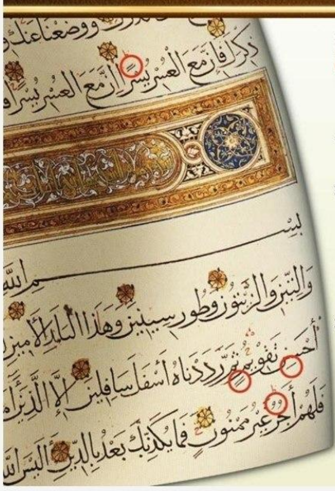

وجعلَ الخليلُ علامةَ الكسرةِ ياءً صغيرةً
مردودةً إلى الخلفِ تحتَ الحرفِ المكسورِ
ذهبَ رأسُها مع مرورِ الأيامِ وبقيتْ جرَّتُها :

وضاعفَ الحركةَ للدَّلالةِ على التنوين :

_______ _______ _______

তানউইন

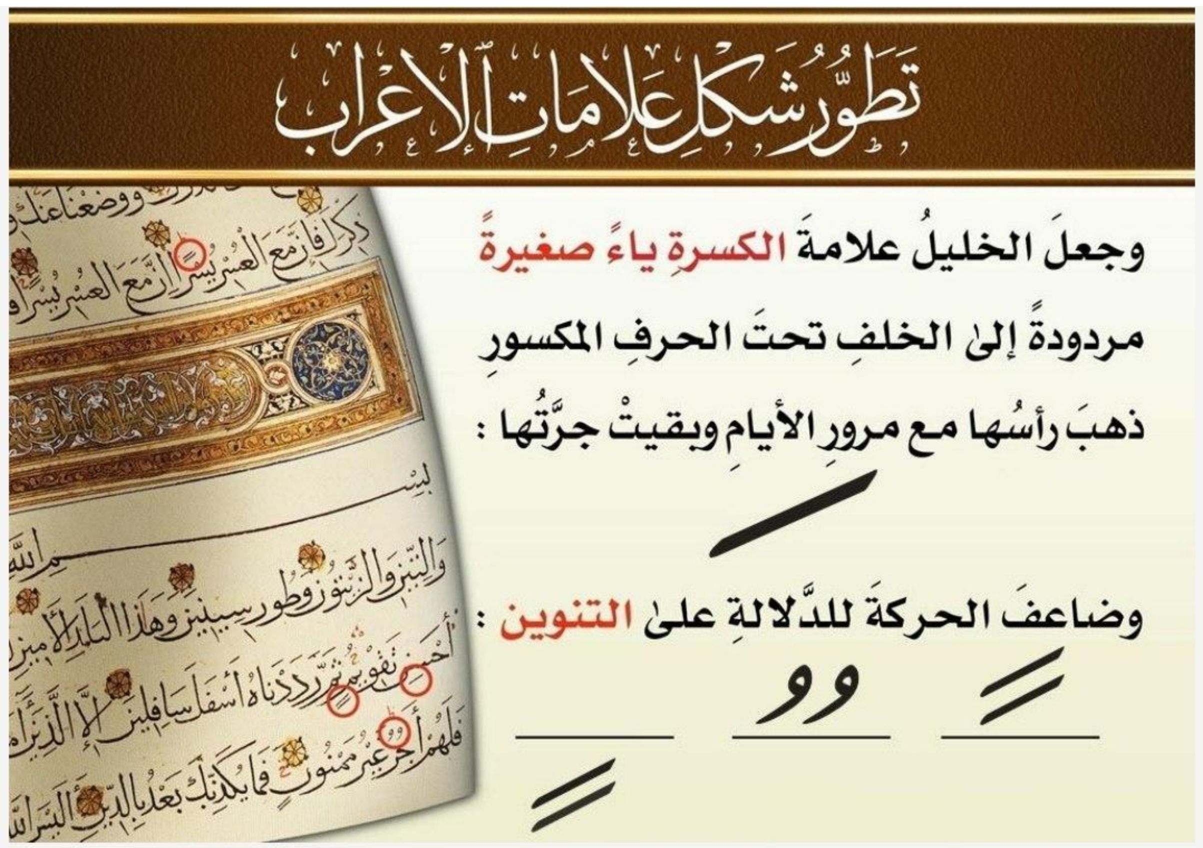

تطوّر شكلِ علاماتِ الإعراب
وجعلَ الخليلُ علامةَ الكسرةِ ياءً صغيرةً
مردودةً إلىٰ الخلفِ تحتَ الحرفِ المكسورِ
ذهبَ رأسُها مع مرورِ الأيامِ وبقيتْ جرَّتُها :
وضاعفَ الحركةَ للدَّلالةِ علىٰ التنوين :

প্রথমে দম্মাতেনের সাথে ছোট একটা নূন লেখা হতো:

সাকিন

সাকিনের আকার নেয়া হয়েছে খফিফের খ এর মাথা থেকে।

জাযাম

জাযামের আকার নেয়া হয়েছে জাযামের মীমের মাথা থেকে।

علامة السكون
وجرىٰ عملُ المغاربةِ علىٰ جعلِ علامةِ السُّكونِ دائرةً
مُفْرغةَ الوَسَطِ (ه) أُخِذتْ من آخرِ كلمةِ (جَزْم) .
جزم
قال العلَّامةُ محمدٌ الخرَّازُ الشَّريشيُّ (ت ٧١٨ هـ)
في منظومتِه : مَوردِ الظمآنِ في رسمِ وضبطِ القرآن :
فَـــدَارَةٌ عَـــلَامَـةُ السُّـــكُونِ أَعْلَاهُ ، وَالتَّشْدِيدُ حَرْفُ الشِّينِ

علامة السكون
وجرىٰ عملُ المغاربةِ علىٰ جعلِ علامةِ السُّكونِ دائرةً
مُفْرغةَ الوَسَطِ (ه) أُخِذتْ من آخرِ كلمةِ (جَزْم) .
ه
قال العلَّامةُ محمدٌ الخرَّازُ الشَّريشيُّ (ت ٧١٨ هـ)
في منظومتِه : مَوردِ الظمآنِ في رسمِ وضبطِ القرآن :
فَـــدَارَةٌ عَـــلَامَـةُ السُّـــكُونِ أَعْلَاهُ ، وَالتَّشْدِيدُ حَرْفُ الشِّينِ

علامة السكون
وجرىٰ عملُ المغاربةِ علىٰ جعلِ علامةِ السُّكونِ دائرةً
مُفْرغةَ الوَسَطِ (ه) أُخِذتْ من آخرِ كلمةِ (جَزْم) .
ه
قال العلَّامةُ محمدٌ الخرَّازُ الشَّريشيُّ (ت ٧١٨ هـ)
في منظومتِه : مَوردِ الظمآنِ في رسمِ وضبطِ القرآن :
فَـــدَارَةٌ عَـــلَامَـةُ السُّـــكُونِ أَعْلَاهُ ، وَالتَّشْدِيدُ حَرْفُ الشِّينِ

তাশদীদ

তাশদীদের আকার নেয়া হয়েছে শাদীদের (স্ট্রং) শীনের মাথা থেকে।

হামযাতুল ওয়াস্বল

হামযাতুল ওয়াস্বলের আকার নেয়া হয়েছে স্বীলাহ এর স্বোয়াদের মাথা থেকে।

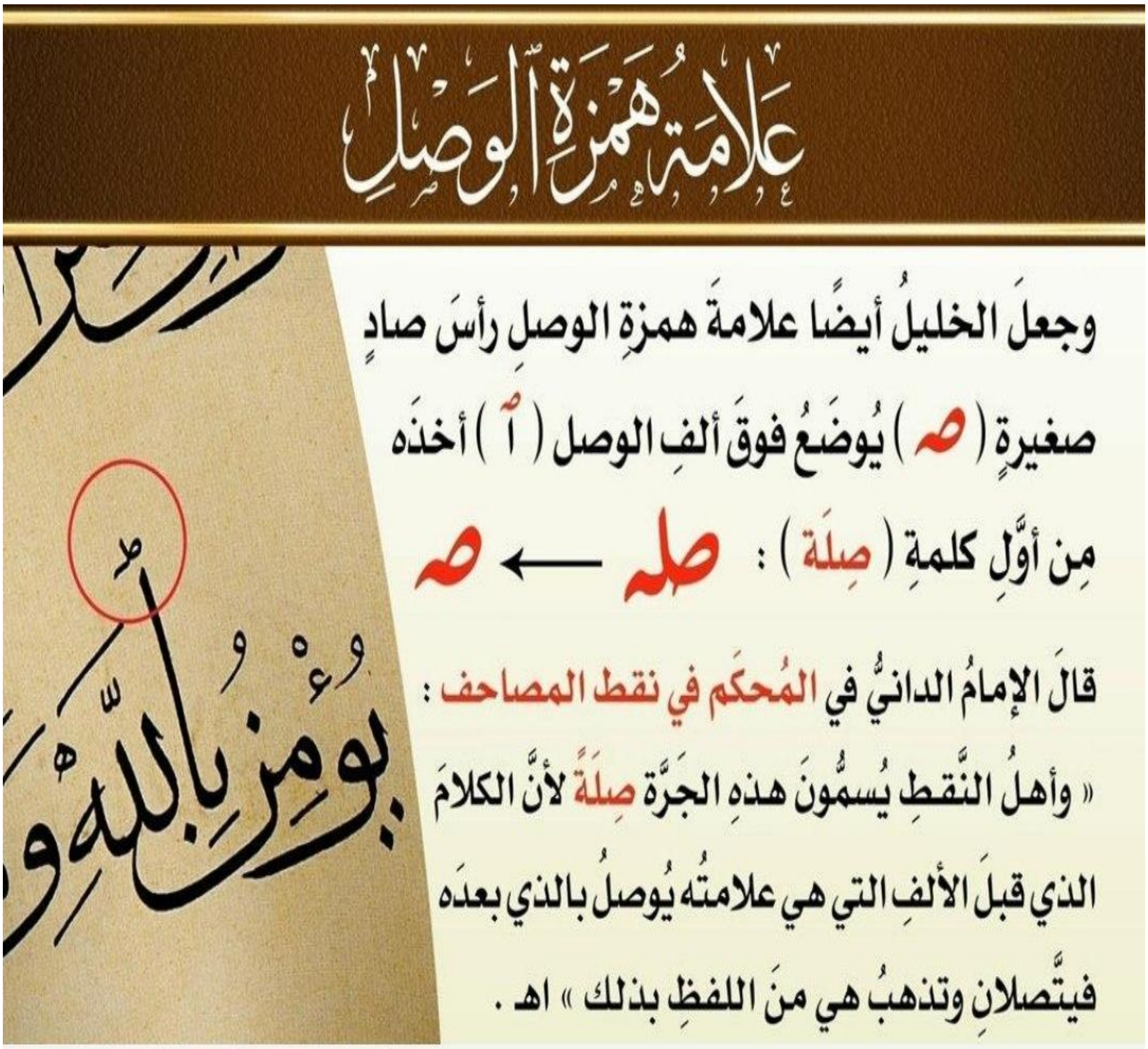

মাদ্দ

প্রথমে মাদ্দ শব্দটি লেখা হতো, এরপর মাদ্দ শব্দটা থেকে এর আকার নেয়া হয়েছে।

কপি: লেখা এবং ছবি আল- মুহকাম ফি নাক্বতাল মাসাহিফ (المحكم في نقط المصاحف) কিতাব থেকে।

আরবী ভাষা চর্চার গুরুত্ব

বাংলাদেশে আরবি ভাষার আগমন : বাংলাদেশের সাথে আরবি ভাষার পরিচয় ঘটে সুদূর অতীতে বাণিজ্য সূত্রে। আরব বণিকেরা বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় বন্দর চট্টগ্রাম বা সন্দ্বীপে পৌঁছতেন এবং সেখান থেকে মিয়ানমার (বার্মা), মালয় উপদ্বীপ ইত্যাদি অতিক্রম করে চীনের ক্যানটন পর্যন্ত যেতেন। আরবে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পরও বাণিজ্য সূত্রে তারা এ দেশে আসতেন এবং তাদের সাথে আসতেন ধর্মপ্রচারকেরা। এভাবে প্রাচীনকালে আরবদের এবং পরবর্তীকালে আরব মুসলিমদের বাংলায় যাতায়াতের ফলে বাংলার অধিবাসীরা আরবি ভাষার সাথে পরিচিত হয়। কালক্রমে এ দেশীয় কিছু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাদের মধ্যে আরবি ভাষা শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইসলাম প্রচারকেরা নামাজ আদায়ের জন্য যেসব মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ করেন, সেখানে আরবি কুরআন পাঠ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবেই এ দেশে আরবি ভাষা চর্চার সূত্রপাত হয়। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আরব বণিক এবং ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় আরবি ভাষার মিশ্রণ শুরু হয়। বাংলাপিডিয়ায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রামাঞ্চল বিশেষত বৃহত্তর চট্টগ্রামের উপভাষার মোট শব্দের প্রায় অর্ধেক আরবি বা আরবি শব্দজাত। তবে বাস্তবতা হলো- ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আরব বণিক আর ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে বহুকাল আগে থেকেই এ দেশে আরবি ভাষা চর্চা শুরু হলেও আজো তা ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভেতরেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে সম্পৃক্ত আরবি ভাষা চর্চার পরিবেশ এখনো এ দেশে তৈরি হয়নি।

বাংলাদেশে আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : আমরা বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী দৈনন্দিন নিজেদের আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, মতামত ও অভিব্যক্তি ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে অসংখ্য আরবি শব্দ ব্যবহার করি। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী আরব দেশগুলোতে কর্মের সন্ধানে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে,

কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আমরা আরবি ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। এভাবে নানা কারণে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরবি ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন-

১. মুসলিম দেশ হিসেবে ধর্মীয় প্রয়োজনে : বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ হওয়ায় দৈনন্দিন ধর্মীয় প্রয়োজনে আরবি ভাষাশিক্ষা ও চর্চার গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই অনুভূত হয়। নামাজ পড়া, কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়া পাঠ করা এবং কুরআন, হাদিস, তাফসির (কুরআনের ব্যাখ্যা) ও ফিকাহর (ইসলামি আইন) বিধিবিধান সঠিকভাবে জানার জন্য আরবি ভাষা শিক্ষার বিকল্প নেই। কারণ ইসলামের বিশুদ্ধ ও মৌলিক জ্ঞান সবই আরবি ভাষায় লিখিত ও রচিত। এ ছাড়া সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ, অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আবির্ভাব এবং পৃথিবীতে মানুষের জীবনাচরণ পরিবর্তনের ফলে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে গবেষণালব্ধ ইসলামের বিধিবিধান জানার মুখাপেক্ষী হতে হয়। আধুনিক যুগ সমস্যার সমাধানকল্পে প্রতিষ্ঠিত বেশির ভাগ ফিকাহ অ্যাকাডেমি ও ইসলামি আইন গবেষণা কেন্দ্র আরব দেশগুলোতে অবস্থিত। এখান থেকেই সাধারণত নতুন নতুন বিষয়ে ইসলামীকরণের যথার্থ ব্যাখ্যা এসে থাকে। তাই ইসলামের সব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান অর্জনের তাগিদে তথা ধর্মীয় প্রয়োজনে আরবি ভাষা চর্চা একান্তই জরুরি।

২. অধিক রেমিট্যান্স অর্জনের লক্ষ্যে : এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যান্স আসে সৌদি আরবসহ আরবি ভাষাভাষী দেশ থেকে। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ আরবদেশগুলোতে পাড়ি জমাচ্ছে। কিন্তু তারা পেশাগতভাবে আরবি ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় যথার্থ বেতনভাতা ও নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভারত-পাকিস্তানের মতো আমাদের দেশেও যদি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশগামী জনশক্তিকে ভাষাগত দক্ষতাসম্পন্ন করে রফতানি করা যেত, তাহলে তারা আরো অধিক বেতন ও নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারত; দেশে আরো অধিক পরিমাণে রেমিট্যান্স আসত। এ দিক বিবেচনায় জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থেই দেশে আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার ব্যবস্থা করে এ ভাষায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা প্রয়োজন।

৩. কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়করণে : আরব দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার ব্যাপক ও সুদূর পরিকল্পনা থাকা দরকার। কারণ আরবদেশগুলো আমাদের দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে প্রচুর আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। বন্যা, সিডর, আইলা ও বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে আমরা আরবদেশগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়ে থাকি। অপর দিকে অনেক আরব দেশ আমাদের চেয়ে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বহু ধাপ এগিয়ে গেছে। দক্ষ আরবিভাষী হয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণের মাধ্যমে আমরা তাদের কাছ থেকে সহজে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়নের রূপরেখা ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক নানা দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি।

৪. ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে : ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, ইসলাম আগমনের বহু বছর আগ থেকেই এ দেশের সাথে আরবদেশের বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক ছিল এবং অদ্যাবধি আছে। এ সম্পর্ককে আরো জোরদার করার জন্য আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার বিকল্প নেই। কারণ আরবেরা ব্যবসায়িক কার্যক্রমসহ সব ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া আরবি ভাষা বর্তমান বিশ্বে ট্রেড ল্যাংগুয়েজ হিসেবে পরিচিতি পাওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী বিশাল ভূখণ্ডের আরব বিশ্বে ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনের জন্য আরবি ভাষা চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশে আরবি ভাষা শিক্ষায় সরকারের ভূমিকা

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুসলিম অধ্যুষিত বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে সরাসরি আধুনিক আরবি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার জন্য সরকারের তেমন কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। যদিও এ দেশে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত আলিয়া মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি পড়ানো হয়, তবুও এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরবি বিশেষজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তাদের

নজর না থাকায় এবং শিক্ষাব্যবস্থায় পেশাগত আধুনিক আরবির বিষয়াবলি সিলেবাসভুক্ত না করায় এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আধুনিক আরবি ভাষায় যোগ্য জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না। অবশ্য সরকার ইচ্ছে করলে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমেও এ দেশে আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার পথকে সুগম করতে পারে। তবে সরকারের কার্যক্রম দ্বারা বোঝা যায় না যে, এ বিষয়ের প্রতি সরকারের তেমন কোনো সুপরিকল্পনা আছে।

পরিশেষে বলতে চাই, বর্তমান বিশ্বে আরবি ভাষার অবস্থান, গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা ভেবে সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচিত হবে ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ভাষাগত দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে আরবি ভাষা চর্চার প্রতি গুরুত্ব দেয়া। সাথে সাথে আরবি পত্রপত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে আরব বিশ্বের সামনে দেশের ভাবমর্যাদাকে উজ্জ্বল করা।

আরবি ভাষা শিক্ষার আরো কিছু কারন

আরবি ভাষা শেখার অনেকগুলো কারন রয়েছে। প্রথমটা অবশ্যই কুরআনকে বুঝতে পারা। মহান আল্লাহ কুরআনে যেখানে আরবি ভাষার উল্লেখ করেছেন সেখানে আরবি ভাষার মর্যাদা বর্ণনা করেননি বরং মূলত এটা বুঝিয়েছেন যে, তোমাদের জানা আরবী ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। তিনি বলেন, إِنَّاجَعَلْنَاهُ قُرْآنًاعَرَبِيًّالَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. আমি একে করেছি কোরআন, আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ। (কুরআন ৩৪:৩)

অন্যান্য কিতাবগুলোও স্ব স্ব নবীর মাতৃভাষায় নাযিল হয়েছে। ভাষাটা এখানে মূখ্য নয়। মূখ্য হল বার্তা বা সংবাদ যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বোঝাতে চান। আরবীকে এজন্যই কুরআনের ভাষা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে যেন আরববাসীরা তা বুঝতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেন,

كَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَاإِلَيْكَ قُرْآنًاعَرَبِيًّالِّتُنذِرَأُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবি ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন। (কুরআন ৪২:৭)

তাহলে প্রশ্ন আসে যে অনারবরা যাদের ভাষা আরবি নয় তারা কিভাবে বুঝবে! উত্তর খুব সহজ, তাদেরকে এটা শিখতে হবে। আর যেহেতু এই কাজটা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকেই করতে হবে এজন্য মহান আল্লাহ এর শিক্ষাকে সহজ করেছেন। তিনি বারংবার কুরআনে উল্লেখ করেন,

وَلَقَدْيَسَّرْنَاالْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। (কুরআন ৫৪:১৭)
দ্বিতীয়ত, আরবি জানলে কুরআনের আয়াত বা হাদিস মুখস্ত করা অনেক সহজ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা কদরের নিম্নোক্ত আয়াত তিনটি লক্ষ্য করি,

]إِنَّاأَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِالْقَدْرِ [٩٧:١] وَمَاأَدْرَاكَ مَالَيْلَةُالْقَدْرِ [٩٧:٢] لَيْلَةُالْقَدْرِخَيْرٌمِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ [٩٧:٣

প্রথম আয়াতে আমরা দেখছি “লাইলাতিল কাদরি” পরের আয়াতগুলোতে “লাইলাতুল কাদরি”। যারা আরবি জানেন না তারা মনে রাখেন এভাবে যে প্রথমে “লাইলাতিল” ও পরের দু’টিতে “লাইলাতুল”। এমনিভাবে কুরআনে আপনি দেখবেন কোথাও মু’মিনুন আবার কোথাও মু’মিনিন। সাধারণভাবে মুখস্ত রাখা অনেক কষ্টসাধ্য, কিন্তু আরবি জানা থাকলে বাক্যের গঠনই আপনাকে বলে দেবে কোথায় কি হবে।
তৃতীয়ত, কুরআন হাদিসের উপস্থাপন সহজ ও প্রাণবন্ত হবে যখন আপনি ভাষার প্রয়োগ ও প্রকাশ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। আরবি না জানলে আপনাকে আলাদা করে

পুরো বাক্যের অর্থ মুখস্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন দ্বিগুন সময় ও শ্রম প্রয়োজন তেমনি আয়াত বা হাদিসের শব্দে শব্দে বিচরণ করা সম্ভব হয়না।

চতুর্থত, কুরআনের অনেকগুলো আলৌকিকত্বের মধ্যে একটা হল তার ভাষা। যেটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, অন্তর দিয়ে দেখতে হয়। আরবি ভাষা বোঝা ব্যাতিত এই আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কুরআনের অলঙ্কার, ছন্দ ও তথ্যের উপস্থাপন এমন যে মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতিকে চ্যালেঞ্জ করে রেখেছেন যে কেউ এর মত একটা সূরাও রচনা করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّانَزَّلْنَاعَلَىٰ عَبْدِنَافَأْتُوابِسُورَةٍمِّن مِّثْلِهِ

যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। (কুরআন ২:২৩)

মানুষ ও জ্বীন উভয়ে মিলেও কেন কুরআনের একটা সূরা রচনা করতে পারবে না? কি এমন গভীরতা এর মাঝে যেখানে কেউ কোনদিন পৌঁছাতে পারবে না? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদেরকে অবশ্যই আরবি জানতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা অনুবাদ কখনই আল্লাহর কালাম নয়। একটা ভাষার অনুবাদ কখনই অনুবাদকৃত ভাষাকে পুরোপুরি ধারন করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ একটি বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে যদিও কবিতার ভাবার্থ বোঝা যায়, কিন্তু কখনই কবিতার আসল স্বাদ ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না।

সবকিছু বিবেচনায় মহান আল্লাহর কালামকে পুরোপুরিভাবে অনুভব করতে হলে আরবি জানার বিকল্প নাই।

আরবী ভাষা শিক্ষার ৭ টি কারন

১। অনুবাদ ছাড়াই রবের কথা বুঝতে পারা

আমাদের প্রিয় কোনো ব্যক্তি যদি ভিনদেশী ভাষায় আমাদের কাছে একটি চিঠি পাঠাতো, তাহলে আমরা এর পাঠোদ্ধারে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিতাম। আমরা এর অনুবাদ করিয়ে নিতে পারি। কিন্তু এর সত্যিকার বক্তব্য মূল ভাষাতেই কেবল পুরোপুরি বোঝা সম্ভব। কোরআনে ব্যবহৃত আরবি ভাষা অর্থের দিক দিয়ে এত সমৃদ্ধ আর পরিপূর্ণ যে, কোনো অনুবাদই এর মূল ভাবের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না।

২। নবীজী (সাঃ) এর কথা বুঝতে পারা

ভাবুন তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস সরাসরি আরবিতে বুঝতে পারলে কত ভালো লাগবে! আরবি জানার অর্থ হলো রাসূলের হাদীসগুলো কোনো অনুবাদের সাহায্য ছাড়াই বুঝতে পারা।

৩। সালাতে খুশু বৃদ্ধি করা

সালাতে আপনার মনোযোগ বেড়ে যাবে। কারণ সুরাহ থেকে শুরু করে তাসবিহ-তাহমিদ সহ সালাতের প্রতিটা কথাই আপনি বুঝে বুঝে পড়তে পারবেন। তখন আপনার সালাত কেবল অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন না হয়ে রবের সাথে আপনার এক অর্থপূর্ণ কথোপকথনে পরিণত হবে। এছাড়া তারাবীহ সালাতের সময় কি আপনার কখনো মনে হয়নি "ইশ! ইমাম সাহেব কী পড়ছেন তা যদি আমি বুঝতে পারতাম!"? আপনার সেই স্বপ্নকে সত্যি করুন আরবি শেখার মাধ্যমে।

৪। গভীর ধর্মীয় জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামী শাস্ত্রের কিতাবাদি পড়তে পারা

যদিও ইসলামী শাস্ত্রের অনেক বই-ই এখন বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তারপরও কিছু বইয়ের গভীরতা কেবল এর মূল ভাষাতেই অনুধাবন করা সম্ভব। হোক তা কোরআনের তাফসির, হাদীসের ব্যাখ্যা বা ফিকহ শাস্ত্রের কিতাব।

৫। এটি পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম ভাষা

পৃথিবীর ৩০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আরবি ভাষাভাষী। ২৪টি দেশের দাপ্তরিক ভাষা আরবি। আরবি শেখার ফলে আপনি সারা পৃথিবীর আরবি ভাষাভাষিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। (এর ফলে আপনার ইসলামী দাওয়াতের কার্যক্রমের ক্ষেত্রও প্রসারিত হবে।–অনুবাদক)

৬। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা

অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে একাধিক ভাষা জানা ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি। আরবি ভাষার দখল আপনার সামনে কর্মের এক বিশাল ক্ষেত্র উন্মোচিত করে দেবে।

৭। নতুন ভাষা শেখার ফলে মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়

বর্ণিত আছে যে ঊমার (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেছেন, "আরবি ভাষা শিক্ষা করো। এর ফলে অন্তর শক্তিশালী হয়।" গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে দ্বিভাষী ও বহুভাষীগণ ভাবের আদান প্রদানে অধিক দক্ষ হন। তাঁদের স্মরণশক্তি ও সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ইসলামে আরবী ভাষা, এর গুরুত্ব ও উম্মতের পুনর্জাগরণে এর ভূমিকা

ইসলামের সাথে আরবী ভাষার সম্পর্ক

যদি আমি একে অনারব ভাষার কুরআন করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন ? কি আশ্চর্য যে, কিতাব অনারব ভাষার আর রাসূল আরবীভাষী। বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা ঈমান আনয়ন করে না, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কুরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হয়। [হা মীম আস-সাজদাহ: ৪৪]

আরবী ভাষার সাথে ইসলামের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও অবিচ্ছিন্ন। পবিত্র কুরআন মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নাযিল হয়েছে আরবী ভাষায়। এবং পুরো কুরআনই আরবী ভাষায় নাযিলকৃত। এটি সম্পূর্ন আরবী এবং এতে কোনো বিদেশী শব্দ নেই। ইমাম শাফেঈ' তার আর-রিসালাহ গ্রন্থে বলেন: "কুরআন এই দিক নির্দেশনা দেয় যে আল্লাহর কিতাবের কোনো অংশই আরবী ভাষার বাইরে নয়...।" আল্লাহর কিতাবের **১১**টি আয়াত হতে এ নির্দেশনা পাওয়া যায় যে কুরআন সম্পূর্ন আরবী ভাষায় নাযিলকৃত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"বিশ্বস্ত রূহ একে নিয়ে অবতরন করেছে। আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হন। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।" [সূরা শু'আরা: **১৯৩-১৯৫**]

"এমনিভাবে আমি এ কুরআনকে আরবী নির্দেশরুপে নাযিল করেছি।" [সূরা রাদ: ৩৭]

"এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি।" [সূরা শুরা: ৭]

"আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে।" [সূরা যুমার: ২৮]

"এবং এ কুরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়।" [সূরা নাহল: ১০৩]

ইসলামী আদর্শের সাথে আরবী ভাষার সম্পর্ক ও এর গুরুত্বকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়।

মৌলিক বিশ্বাস: এক্ষেত্রে ভাষা তেমন প্রাসঙ্গিক নয়। কোনো ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে ঈমান এনে আল্লাহ, তার ফেরেশতা, রাসূল, ওহী, বিচার দিবস ও কদর-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে মুসলিম হতে পারে। এক্ষেত্রে ভাষার জ্ঞান থাকা অনিবার্য নয়।

পালন: ইসলাম পালন করার জন্য কিছু পরিমান আরবী জানা অবশ্যই দরকার। উদাহরণসরূপ, নামায আদায় ইত্যাদি।

ইসলামী জ্ঞান ও আইনবিদ্যা: ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে প্রকৃতভাবে জানতে হলে ও ইসলামী শরীয়াহর আইনসমূহ অধ্যয়ন করতে হলে আরবী ভাষার জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয়। উদাহরণসরূপ, হকুম শরঈ', উসূল আল ফিকহ ইত্যাদি। সকল যুগেই মুসলিম পন্ডিতগণ ইজতিহাদের জন্য আবশ্যক আরবীভাষা, এর নাহু-সরফের জ্ঞান, শব্দভান্ডার, ব্যকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমানে জ্ঞান রাখতেন।

শাইখ তাকী (রহ) বলেন, "ঈমান ও আহকাম বোঝার বিষয়টি ইসলামে দুটি ভিন্ন বিষয়। ইসলামে ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলী দলীল দ্বারা। যাতে করে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে। কিন্তু আহকাম বোঝার বিষয়টি শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে না, বরং আরবী ভাষা জানার উপর, হুকুম বের করে আনার যোগ্যতা, দূর্বল হাদীস হতে সহীহ হাদীস পৃথক করার উপরও নির্ভর করে।" [১]

যেহেতু ইসলামী শরী'য়াহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় এবং যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি সেহেতু ইসলাম নিয়ে যেকোনো গভীর অধ্যয়ন-এর সাথে আরবী ভাষার অধ্যয়ন থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। এখানে আরবী ভাষা বলতে প্রাচীন (Classical) আরবী ভাষা ও তার কাঠামোকে বোঝানো হচ্ছে। কথ্য ও আঞ্চলিক ভাষার চর্চা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। এছাড়াও ইসলামী সভ্যতাকে শক্তিশালীভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য আরবী ভাষাকে বিকৃতির হাত রক্ষা করাও আবশ্যক।

আমাদের সালাফ তথা পূর্ববর্তীগণ এ বিষয়গুলো খুব ভালোভাবেই বুঝতেন। বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলেও এ বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

উমর (রা) আবু মূসা আশ'আরী (রা)-কে চিঠিতে লিখেছিলেন, "সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন ও আরবীর জ্ঞান অর্জন কর এবং কুরআন আরবীতে অধ্যয়ন কর কারণ এটা আরবী।" [২]

আরেকটি বর্ণনায় উমর (রা) বলেন, "আরবী শেখ কারণ এটি তোমাদের দ্বীনের অংশ"। তিনি আরো বলেছেন, "কারো কুরআন পড়া উচিত নয় ভাষার জ্ঞান ছাড়া"।

উবাই বিন কা'ব (রা) বলেছেন, "আরবী ভাষা শেখ ঠিক যেভাবে তোমরা কুরআন হিফজ করা শেখ"। [৩]

আলী (রা) যখন কুফায় তার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন তখন সেখানে তিনি নতুন একধরনের আরবীর চর্চা দেখতে পান। এতে তিনি বেশ চিন্তিত হন এবং তিনি তৎকালীন আরবী পন্ডিত আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালীর সাথে বৈঠক করেন এবং তাকে আরবী

ভাষার মৌলিক নীতিসমূহ বিশ্লেষন করেন। ইবনু কাছীর (রহ) তার আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে লিখেছেন,

"আবুল আসওয়াদ হচ্ছে তিনি যাকে নাহুজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত করা হয়। এবং বলা হয়, যারা এ বিষয়ে কথা বলেছেন তাদের মধ্যে তিনি প্রথমদিককার একজন। তিনি তা আমীর-উল-মু'মিনীন আলী ইবনে আবী তালিব (রা) হতে গ্রহণ করেছেন।" [৪]

ইমাম শাফেঈ' আরবী ভাষার জ্ঞান থাকাকে ফরজে আইন মনে করতেন এবং তিনি তার আরব ছাত্রদের আরবী ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করার তাগিদ দিতেন। তিনি তার ছাত্রদের বলতেন, "নিশ্চয়ই আমি জ্ঞান অন্বেষনকারীদের ব্যপারে এই ভয় পাই যে তারা আরবী ভাষার নাহু (ব্যকরণ) সঠিকভাবে জানবে না এবং এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই হাদীসের (বাস্তবতার) মধ্যে প্রবেশ করবে, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন (জাহান্নামের) আগুনের মধ্যে তার আসন খুজে নেয়'"। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহও ইমাম শাফেঈ'র মতো অনেকটা একই মত পোষন করতেন। তার মতে যেহেতু একজন মুসলিমের জন্য কুরআন সুন্নাহ বোঝাটা আবশ্যক সেহেতু "অত্যবশ্যকীয় কিছু পালন করার জন্য যা প্রয়োজন তাও অত্যাবশ্যক"-এই নীতি অনুযায়ী আরবী ভাষা শেখাও আবশ্যক। তিনি আরো বলতেন, "আরবী ভাষা ইসলাম ও এর অনুসারীদের প্রতীক এবং যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি দ্বারা জাতিসমূহ নিজেদের পৃথক করে ভাষা তাদের মধ্যে অন্যতম।" [৫]

মু'জিযা

২৮ টি হরফ। এ কটি হরফ ও এর দ্বারা গঠিত শব্দ দিয়েই পৃথিবীতে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়। আমরা জানি, কুরআন একটি মু'জিযা যা মানবজাতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জসরূপ। এবং অন্যান্য নবী-রাসূলদের মু'জিযার সাথে কুরআনের পার্থক্য হচ্ছে, অন্যান্য নবী-রাসূলদের সময় শেষ হলে তাদের মু'জিযারও সমাপ্তি ঘটত, কিন্তু কুরআন একটি চলমান মু'জিযা যার সমাপ্তি হয়নি। যদিও কুরআনের মু'জিযা হওয়াটা আমাদের কাছে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রমাণিত। কিন্তু এ বিষয়টি শুধু জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অভিজ্ঞতা দ্বারা নয় (But this is only through knowledge, not through experience) । একমাত্র আরবী ভাষা শেখা ছাড়া এ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি অর্জন করা সম্ভব নয়।

ঐতিহাসিকভাবে এ ভাষার অবহেলা ও এর পরিনাম

মুসলিমদের পতনের পেছনে যেভাবে কাফেরদের চক্রান্ত ছিল, ঠিক একইভাবে মুসলিমদের মধ্যেও বেশ কিছু দূর্বলতা দেখা দিয়েছিল। এবং এসব কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম এক কারণ হলো আরবী ভাষার প্রতি অবহেলা। যদিও মুসলিমরা এ ভাষার গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল, কাফেররা ঠিকই এ ভাষার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল। এ জন্যই তারা আরব-তুর্কিদের মধ্যে বিভেদ লাগানোসহ আরো অনেক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। শাইখ তাকী (রহ) তার বই "ইসলামী রাষ্ট্র"-তে বলেন:

"এরপর ইসলামের শত্রুরা আরবী ভাষার উপর আক্রমণ চালায়। কারণ, এই ভাষাতেই ইসলাম এবং এর হুকুম আহকামকে প্রচার করা হয়। তাই, তারা ইসলামের সাথে আরবী ভাষার সম্পর্ককে ছিন্ন করতে ব্যাপক তৎপরতা চালায়। কিন্তু, প্রথমদিকে তারা সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। কারণ, প্রথমদিকে মুসলিমরা যে দেশই জয় করেছে সেখানেই তারা কোরআন, সুন্নাহ ও আরবী ভাষাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে এবং জনগণকে তারা এ

তিনটি জিনিসই শিক্ষা দিয়েছে। বিজিত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আরবী ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলেছে। কিছু কিছু অনারব এ ব্যাপারে এতো পারদর্শীতা অর্জন করেছে যে, তারা ইসলামের প্রখ্যাত মুজতাহিদও হয়েছে। যেমন, ইমাম আবু হানিফা। কেউ কেউ বা হয়েছে অত্যন্ত উচুঁ মাপের কবি, যেমন, বাশার ইবন বুরদ। আবার, কেউ বা হয়েছে প্রখ্যাত লেখক, যেমন, ইবন আল-মুকাফফা'। এভাবেই, মুসলিমরা (প্রথমদিকে) আরবী ভাষাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিল। ইমাম শাফেঈ' কুরআনের কোন ধরনের অনুবাদ বা অন্য কোন ভাষায় সালাত আদায় করাকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। আবার, যারা কুরআন অনুবাদের অনুমতি দিয়েছেন, যেমন, ইমাম আবু হানিফা, তারা অনুবাদকে কুরআন হিসাবে স্বীকৃতি দিতেও অস্বীকার করেছেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে আরবী ভাষা সবসময় মুসলিমদের মনোযোগ ও গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। বস্তুতঃ এ ভাষা হচ্ছে ইসলামের মৌলিক অংশ এবং ইজতিহাদের জন্য এক অপরিহার্য বিষয়। আরবী ভাষা ব্যতীত উৎস থেকে ইসলামকে বোঝা অসম্ভব এবং এ ভাষা ব্যতীত শরীয়াহ্ থেকে নির্ভুল ভাবে হুকুম-আহকাম বের করাও সম্ভব নয়। কিন্তু, হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে, আরবী ভাষার গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। কারণ, এ সময় এমন সব শাসকেরা ক্ষমতায় আসে যারা আরবী ভাষার প্রকৃত গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং এ বিষয়টিকে তারা ক্রমাগত অবহেলা করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে, রাষ্ট্রের নাগরিকদের আরবী ভাষার উপর দখল কমে যায় এবং ইজতিহাদের প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে যায়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, যেকোনো বিষয়ে শরীয়াহ্‌র হুকুম খুঁজে বের করতে হলে, যতগুলো উপাদান অপরিহার্য তার মধ্যে আরবী ভাষা একটি। বস্তুতঃ ইতিহাসের এই পর্যায়ে, আরবী ভাষা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে, রাষ্ট্রের শরীয়াহ্ সম্পর্কিত ধ্যানধারণাও অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সেইসাথে, অস্পষ্ট হয়ে যায় শরীয়াহ্ আইনকানুন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া। ইসলামী রাষ্ট্রকে দূর্বল ও রুগ্ন করে ফেলতে এ বিষয়টি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের পক্ষে নতুন নতুন সমস্যা সমূহকে বোঝা এবং সে সমস্যাগুলোর মুকাবিলা করা কঠিন হতে থাকে। একসময় রাষ্ট্র উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয় কিংবা সমাধানের লক্ষ্যে ভ্রান্ত পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। এভাবে, সময়ের

সাথে সাথে রাষ্ট্রের সমস্যা ঘনীভূত হতে থাকে এবং ইসলামী রাষ্ট্র একসময় অন্তহীন সমস্যার সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে।" [৬]

সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় এ ভাষা অবহেলার পরিনাম কতটা মারাত্মক ছিল।

এ ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য

আরবী একটি অত্যন্ত চমৎকার ভাষা। এর কাঠামো অত্যন্ত দৃঢ়, সংগঠিত ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুবই জটিল। অনেক ভাষাবিদই এ চিন্তা করে হতবাক হন যে কিভাবে এ ভাষা প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভব হলো।

শব্দপ্রাচুর্য

শব্দের প্রাচুর্যে এ ভাষা অতি সমৃদ্ধ ও সুন্দর।
বর্ণনা ও প্রকাশভঙ্গি অতি সূক্ষ্ম। প্রতিটি অর্থ প্রকাশার্থে ভিন্ন শব্দ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ দিনের প্রতিটি অংশের জন্য আলাদা শব্দ আছে। তেমনি চন্দ্র মাসের প্রতিটি রাতের জন্য, মাথার চুলের ও চোখের প্রতিটি অংশের জন্য, দাঁতের জন্য, দেখার, চলার, বসার, শোয়ার প্রতিটি ভঙ্গির জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আছে। এ ভাষায় একটি মাত্র ক্রিয়া দ্বারা অনেক অর্থের প্রকাশ সম্ভব।
অন্য ভাষায় এসব অর্থ প্রকাশের জন্য কয়েকটি ক্রিয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

সর্বমর্মী বচন

এ ভাষায় অল্প কথায় বা বাক্যে অনেক অর্থ প্রকাশ করা যায়। শব্দ বা উচ্চারণের দিক থেকে অল্প, কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক তাকেই সর্বমর্মী বচন বলা হয়। পবিত্র কোরআন-হাদিস ও আরবি সাহিত্যে সর্বমর্মী বচনের অনেক দৃষ্টান্ত মেলে।

সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দের আধিক্য

সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দের অত্যধিক সমাবেশ এই ভাষায় পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বছরের জন্য ২৪, আলোর জন্য ২১, অন্ধকারের জন্য ৫২, সূর্যের জন্য ২৯, বৃষ্টির জন্য ৬৪, পানির জন্য ১৭০, উটের জন্য ২৫৫, সিংহের জন্য ৩৫০টি শব্দ আছে। এমন শত-সহস্র শব্দে আরবি সমৃদ্ধ হয়ে আছে। বিপরীতার্থক শব্দেরও কমতি নেই এই ভাষায়।

শব্দের অর্থের আধিক্য

একটি শব্দের বহু অর্থ হয়, এমন সব শব্দ আরবিতে অধিক হারে পাওয়া যায়। এমন শত শত শব্দ আছে, যাদের তিন, চার অথবা পাঁচটি অর্থ আছে।

আওয়াজের অনুকরণে শব্দ

পাখির সুমিষ্ট স্বর ও জীবজন্তুর নানা আওয়াজের অনুকরণে আরবি ভাষায় বিভিন্ন শব্দ রয়েছে। যেমন বৃষ্টি বর্ষণের রিমঝিম, মেঘ গর্জনের গুরগুর, স্রোতের কলকল ধ্বনি ইত্যাদির জন্য তাদের ভাষায় বহু শব্দ আছে। হমহমা, করকরা, বরবরা, জরজরা ইত্যাদি শব্দ উদাহরণস্বরূপ পেশ করা যায়।

প্রবাদ বাক্য

প্রবাদ বাক্যের জন্য আরবি বিখ্যাত। তাদের অভিজ্ঞতার ফলে এসব প্রবাদ বাক্য সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোকে হিকমাতুল আরব অর্থাৎ আরবদের প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করা হয়। আরবে ভালো কবিদের অনেক কবিতা প্রবাদ বাক্য হিসেবে সবার মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে যেত।

আরবী ভাষার কিছু গ্রামাটিককল স্ট্রাকচার

নিম্নে আরবী ভাষার (Grammatical Structure) সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়া হল:

পদ

পদ বা শব্দের শ্রেণীবিভাগ (اجزاء الكلام): শব্দকে তিনভাগে ভাগ করা হয় আরবীতে

১. বিশেষ্য/Noun (اسم) ২. ক্রিয়া/Verb (فعل) ৩. অব্যয়/Particle (حرف)

লিঙ্গ (الجنس): আরবী ভাষায় লিঙ্গ মূলত দু'টি, পুংলিঙ্গ (المذكر) ও স্ত্রীলিঙ্গ (المئنث)। উদাহরনসরূপ, (زيد، خالد، احمد) এগুলো পুংলিঙ্গবাচক শব্দ আবার (فاطمة، داكا، ريح، نار، يد) এগুলো স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ। এছাড়াও এ ভাষায় কিছু সংখ্যক উভয় লিঙ্গের শব্দও রয়েছে যাদের (الجنس المشترك) বলা হয়। এ ভাষায় কোনো ক্লীবলিঙ্গ নেই।

বচন

বচন (العدد): আরবী ভাষায় বচন মূলত তিনটি।

১. একবচন (واحد) ২. দ্বিবচন (تثنية) ৩. বহুবচন (جمع)

এছাড়াও আরবী ভাষায় বহুবচনের বহুবচন-এর প্রচলন রয়েছে, যেমন- (فتح، فتوح، فتوحات)। এ বৈশিষ্ট সমূহের ফিকহী গুরুত্ব অপরিসীম। এর ফলে ফিকহ-এর কোনো মাসআলাকে অত্যন্ত নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা যায়।

ক্রিয়া

ক্রিয়া (الفعل): নিম্নোক্তভাবে আরবী ক্রিয়াকে ভাগ করা হয়,

১. অতীতকাল (الفِعْلُ الْماضِي)   ২. বর্তমান/ভবিষ্যৎ কাল (الفِعْلُ الْمُضارِي)
৩. নির্দেশবাচক (فِعْلُ الأَمْر)

এ ভাষায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের জন্য একটিই স্ট্রাকচার রয়েছে। যদিও কখনো কখনো ভবিষ্যৎকে আলাদা করে বোঝানোর জন্য (فعل)-এর আগে একটি (س) যুক্ত করা হয়, যেমন, (بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا)। [৭] এছাড়াও বচন, লিঙ্গ, কাল ইত্যাদি ভেদে ক্রিয়ার শাব্দিক রূপান্তর ঘটে যাকে (صَرْفُ الفِعْل) বলা হয়। এ বৈশিষ্ট্যের কারণেও ফিকহ-এর কোনো মাসআলাকে অত্যন্ত নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা যায়।

ই'রাব

ই'রাব (الإعرَب): সাধারণত বাক্যে প্রতি (مُعْرَب) শব্দের শেষ হরফের স্বর-চিহ্ন হলো ই'রাব। এ স্বর-চিহ্ন পরিবর্তনশীল, অবস্থার পরিবর্তনভেদে একটি শব্দের শেষ হরফ যবর

(فَتْحَة), যের (كَسْرَة), পেশ (ضَمَّة) বা সুকূন গ্রহণ করতে পারে। যেমন, সাধারণত শব্দটি কর্তা (فاعِل) হলে পেশ গ্রহণ করে, কর্ম (مَفْعُول) হলে যবর গ্রহণ করে ইত্যাদি। পৃথিবীতে এ ধরনের স্বর-চিহ্ন বর্তমানে আরবী ছাড়া হাবশী ও জার্মান ভাষায় কিছুটা রয়েছে। স্বর-চিহ্ন প্রাচীন সভ্যতার একটি নিদর্শন। [৮] উদাহরণসরূপ, (جَاءَ زَيْدٌ، ضَرَبَ زيدً، قَلَمُ زَيْد)

আরবী ভাষা প্রধানত একটি মূলশব্দ তাড়িত ভাষা (root-driven language)। এ ভাষায় বিভিন্ন Pattern (وزن)-এ অসংখ্য মূল শব্দ (مَصْدَر বা فِعْل) রয়েছে। উদাহরণসরূপ, (فَعَلَ، سَمِعَ، نَصْرٌ، ذَكَّرَ، تَعْلِيْم)। এসব মূল শব্দ হতে অসংখ্য শব্দ বের হয়ে আসে যাদের (مُشْتَقات) বলা হয়। উদাহরণসরূপ, (عِلْمٌ) এ শব্দের উপাদান (مادة) হচ্ছে (ع ل م) যা থেকে বের হয়ে আসে, (عَلِمَ، مَعْلُوم، عَلَّمَ، تَعْلِيم، مُعَلِّم، مُتَعَلِّم، عَلاّمَة)।

কোনো ভাষার শক্তি পরিমাপ করতে হলে সে ভাষার শব্দভান্ডার-এর পরিমান দেখতে হয়। ভাষার শব্দ যত বেশি তত বেশি শক্তিশালী সে ভাষা। আরবী ভাষা এক্ষেত্রে এগিয়ে অর্থাৎ এ ভাষার বিশাল শব্দ ভান্ডার রয়েছে। যেখানে বাংলায় সব মিলিয়ে রয়েছে মাত্র ১ লক্ষ এবং ইংরেজীর রয়েছে ২ লক্ষাধিক শব্দ।

আরবী ভাষায় অনেক শব্দ রয়েছে যা বিভিন্ন অর্থে প্রকাশ পায়। উদাহরণসরূপ, (قضاء، قدر)। এ বৈশিষ্ট্য আরবী ভাষাকে আরো শক্তিশালী করেছে।

অল্প কথায় বা বাক্যে অনেক অর্থ প্রকাশ আরবীতে যেমন সম্ভব অন্য ভাষায় তেমন সম্ভব নয়। আরবীতে প্রবাদ রয়েছে (خَيْرُ الكَلامِ ما قَلَّ وَدَل) অর্থাৎ উত্তম কথা হলো সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ। কুরআন ও হাদীস এমনি সব সংক্ষিপ্ত অর্থপূর্ণ বাক্যে পরিপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সা)ও বলেছেন, 'আমাকে (جَوَامِعَ الْكَلِم) দেওয়া হয়েছে' [৯] অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত কথায় গভীর জ্ঞান দেবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তাকে। এ বিষয়টির উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করা যেতে পারে,

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

"উপহার বিনিময় কর, একে অপরকে ভালোবাসতে পারবে।" [১০] অর্থাৎ উপহার বিনিময় করলে পারস্পরিক ভালোবাসা-সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।

এ ভাষার বর্ণনাশৈলী এত চমৎকার যে তা শ্রোতার কাছে ছবির মতো ধরা দেয়। এবং পবিত্র কুরআনে এ রকম অসংখ্য আয়াত রয়েছে। উদাহরণসরূপ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ~ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সবচেয়ে সুন্দর ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উফ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে সম্মানজনকভাবে কথা বল। তাদের উপর রহমত (ভালবাসা/স্নেহ/দয়া/মমতা/করুনা) দিয়ে তোমার নতজানু হয়ে থাকা বিনয়ের ডানা মেলে দাও এবং বল: হে প্রতিপালক, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।" [বনী ইসরাঈল: ২৩-২৪]

এ ভাষার এক অসামান্য সামর্থ্য রয়েছে অন্যান্য ভাষাকে গ্রাস করে ফেলার যখন তারা এর নিকটে আসে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ দাওয়া নিয়ে যে অঞ্চলেই গেছেন, কিছুদিনের মধ্যেই সে অঞ্চলের লোকজনের ভাষা সহজেই আরবীতে পরিনত হয়েছে। এর ফলে খিলাফতের অভ্যন্তরে অনেক অনারব আরবীতে অত্যন্ত পারদর্শী ব্যক্তিত্বে পরিনত হয়েছে।

এমনকি আরবী ভাষার ব্যকরণের পথিকৃত সিবাওয়েও একজন অনারব ছিলেন। পরবর্তীতেও অনেক যুগ পর্যন্ত এ ধারা বজায় ছিল। কোনো অঞ্চলে অবহেলার কারণে এ ভাষা প্রতিষ্ঠা না হতে পারলেও সে অঞ্চলের বিদ্যমান ভাষার উপর ব্যপক প্রভাব বিস্তার করে গেছে এ ভাষা যা এখনও বিদ্যমান।

এ ভাষার আরো একটি সামর্থ্য হচ্ছে, এ ভাষা বিদেশী কোনো ভাষার শব্দকে আরবী শব্দতে রূপান্তর করতে পারে। অন্যকথায়, এ ভাষা অন্য ভাষার শব্দ Arabize তথা (مُعَرَّب) মু'আর্রাব করতে পারে। এ ভাষায় শব্দ ও এর আরবী রূপান্তর নিয়ে ইজতিহাদ করার জন্য জ্ঞানের আলাদা শাখা রয়েছে।

ইজতিহাদ

ইজতিহাদের জন্য শর্তাবলী রয়েছে যা উসূলের আলেমগণ ব্যখ্যা করে গিয়েছেন। এর জন্য দরকার বিস্তৃত জ্ঞান, কুরআন-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান ও যথেষ্ঠ পরিমান আরবী ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান... [শাইখ তাকী উদ্দীন আন-নাবহানী, মাফাহীম, পৃষ্ঠা ৪৬]

আরবী ভাষার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হচ্ছে ইল্লত আহরণ অর্থাৎ একজন মুজতাহিদ কোনো নস (نص) থেকে হুকুমের পেছনের 'ইল্লাহ' বের করতে পারেন এবং অন্য পরিস্থিতিতে এর প্রয়োগ করতে পারেন। এছাড়াও আইনগত দিক থেকে, আরবী ভাষায় কোনো বাক্যে বিভিন্ন শব্দের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বাক্যেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রদান করে। উদাহরণসরূপ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ইমাম হচ্ছে রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং সেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এখানে 'সেই' শব্দটি আরবী ব্যকরণের পরিপ্রেক্ষিতে সীমিতকরণ (اداة حصر)-এর হুকুম পায় এবং এটি একটি আলাদা সর্বনাম। এভাবেই তাঁর (সা) বক্তব্য, 'এবং সেই জিজ্ঞাসিত হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে' (রাষ্ট্রের) জন্য

দায়িত্বশীলতাকে ইমামের জন্য সীমিত করে। সুতরাং, রাষ্ট্রের মধ্যে মূলত খলীফা ছাড়া আর কেউই শাসন করবার কোনো ক্ষমতা রাখেনা, হোক ব্যক্তি অথবা দল। [১১]

ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে সর্বশেষ জীবনব্যবস্থা। দুনিয়ার সমাপ্তি পর্যন্ত এ দ্বীন দিয়েই সমাজ পরিচালনা করতে হবে। আর এ কাজ করতে গিয়ে যুগে যুগে মুসলিম জাতিকে অসংখ্য নতুন সমস্যার সম্মুক্ষীন হতে হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে ভবিষ্যতেও হতে হবে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে ইজতিহাদ। ইজতিহাদ হচ্ছে সেই ইঞ্জিন যা ইসলামকে চালিত করে। এটি না থাকলে উম্মাহর মধ্যে জলাবদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং উম্মাহর সমৃদ্ধি থমকে যাবে। এবং ঐতিহাসিকভাবেও এ বিষয়টির সত্যতা আমরা দেখেছি। শাইখ তাকী (রহ) বলেন,

"(মুসলিম উম্মাহ্‌র) এ অধ:পতনের পেছনে একমাত্র একটি কারণই ছিল, (মুসলিমদের) প্রচন্ড দূর্বলতা যা তাদের ইসলামকে বোঝার জন্য চিন্তা করার যোগ্যতা ধ্বংস করে দিয়েছিল। এ দূর্বলতার পেছনের কারণ ছিল ৭ম শতাব্দী হিজরীর প্রথম থেকে শুরু করে ইসলাম ও আরবী ভাষার বিচ্ছিন্নকরন যখন আরবী ভাষা ও ইসলামের প্রসার অবহেলিত হয়েছে। সুতরাং, যতক্ষন পর্যন্ত আরবী ভাষাকে ইসলামের সাথে এর এক অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অংশ হিসেবে মিশ্রিত না করা হবে, ততক্ষন পর্যন্ত এ অধ:পতন মুসলিমদের আরো অবনতির দিকে নিয়ে যাবে। এটা এ কারণে যে, এই ভাষার ভাষাগত ক্ষমতা ইসলামের শক্তিকে এমনভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে যে একে ছাড়া ইসলামকে বহন করা সম্ভব নয়, এবং যদি একে অবহেলা করা হয়, তবে শরীয়াহ্‌র মধ্যে ইজতিহাদ করা আর সম্ভবপর হবে না। (আর) আরবী ভাষার জ্ঞান ইজতিহাদের জন্য একটি মৌলিক শর্ত। এছাড়াও ইজতিহাদ উম্মতের জন্য অপরিহার্য যেহেতু এর সদ্ব্যবহার ছাড়া উম্মাহর উন্নয়ন সম্ভব নয়।" [১২]

সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে উম্মাহর সমৃদ্ধির সাথে আরবী ভাষার সম্পর্ক কত গভীর।

উম্মাহ্‌র পূনর্জাগরণ

নিশ্চয়ই আল্লাহ এ কিতাবের দ্বারা বিভিন্ন জাতিকে উচ্চকিত করেন আর অন্যান্যদের করে দেন নিচু। [মুসলিম]

পূনর্জাগরণ বস্তুগত বা বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের মধ্যে নিহিত নেই। বরং চিন্তাগত ও মতাদর্শিক উন্নয়নই পূনর্জাগরনের সঠিক ভিত্তি আর বস্তুগত উন্নয়ন হচ্ছে এর ফলাফল। আমরা যখন উম্মতের পূনর্জাগরনের কথা বলি তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ পুনর্জাগরণ ইসলামী আকীদাহ ও তা থেকে বের হয়ে আসা ব্যবস্থার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ আমাদেরকে পৃথিবীতে এ আকীদাহ প্রতিষ্ঠা ও এর ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এবং এ ব্যবস্থাটি রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মধ্যে আরবী ভাষায়। অতীতে আরবরা পৃথিবীর শ্রেষ্ট জাতিতে পরিনত হয়েছিল কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এ ভাষায় পবিত্র কুরআন নাযিল করেছিলেন। এবং এ ভাষাতেই তারা শরীয়াহ বুঝেছিলেন এবং তা বাস্তবায়ন করেছিলেন। এবং আরবী ভাষার কোনো কিছু সবচেয়ে ভালোভাবে আরবীতেই বোঝা যাবে। এক্ষেত্রে অনুবাদ গ্রহণযোগ্য নয় যেহেতু ভাষার অর্থ ও আকুতি অনেকটাই অনুবাদে হারিয়ে যায়। অন্য যেকোনো ভাষার সাহিত্য অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। উদাহরণসরূপ, আমরা শেক্সপিয়ারকে ইংরেজি, ইকবালকে উর্দূ, নজরুলকে বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষাতেই পূর্নাঙ্গরূপে বুঝতে পারবো না। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থার খুটিনাটি বিশ্লেষন বুঝতে হলে আরবী ভাষার জ্ঞানও থাকতে হবে।

আমরা যারা হুকুম শরঈ' নিয়ে পড়াশুনা করেছি তারা জানি যে, ফরয-এ-কিফায়া ও আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বাধ্যতামূলক ফরয দায়িত্ব এবং ফরয হিসেবে ফরয-এ-আইন হতে কোনো অংশে এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শুধুমাত্র পার্থক্য হল, ফরয-এ-কিফায়াকে পালন করার জন্য আল্লাহ পুরো উম্মতকে একসাথে দায়িত্ব দিয়েছেন, উম্মতের প্রত্যেকটি সদস্যকে আলাদা আলাদা চিহ্নিত করে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। কিন্তু উম্মাহর মধ্যে যথেষ্ঠ

পরিমান সদস্য যদি সন্তোষজনকভাবে এ দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে কাজটি সম্পন্ন করাটা পূরো উম্মতের জন্য ফরজে আইন হিসেবে ঝুলে থাকে। আমরা জানি ইজতিহাদ করাটা ফরযে কিফায়া এবং ইজতিহাদ করার জন্য আরবী ভাষা জানাটাও আবশ্যক। এবং উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক যুগে অবশ্যই যথেষ্ঠ পরিমানে মুজতাহিদ থাকতে হবে। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে কি আমরা সে পরিমান মুজতাহিদ ও সেরকম ইজতিহাদ চর্চা দেখতে পাবো ? এখন আমরা একটু চিন্তা করলেই উপলব্ধি করতে পারবো যে বর্তমানে আরবী ভাষার জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য কতটা জরুরী। এছাড়াও খিলাফত প্রতিষ্ঠার দা'য়ী হিসেবে উম্মতের কাছ থেকে আস্থা ও নেতৃত্ব অর্জন করার জন্য আরবী ভাষা জানাটা খুবই জরুরী।

মুসলিমদের জন্যে আরবী ভাষা শিক্ষার আরো ১০ টি কারন

১। সর্বশক্তিমান এবং মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর পূর্ব,বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত ভাষাগুলো থেকে আরবিকে একচ্ছত্রভাবে বেছে নিয়েছেন সৃষ্টিজগতের কাছে তার বাণী পৌছানোর মাধ্যম হিসেবে। এই একটি সত্যই মুসলিমদের আরবি শেখার কারণ হিসেবে যথেষ্ট। আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তিনি অবশ্যই অন্য কোনো একটি ভাষায়ই শুধু নয় বরং অন্য সমস্ত ভাষাতেই কুরআন নাযিল করতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজের পবিত্র কুরআনে বলেন,”নিশ্চই আমি একে আরবি ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।“ এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে আরবির কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। আর আল্লাহ তা'আলার সূক্ষ রহস্যগুলো এমনভাবে প্রচার করে যা অন্যান্য ভাষার দ্বারা সম্ভব নয়। উপরন্তু আল্লাহ নিজেই আরবিকে এসব অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং অন্যান্য ভাষার উপরে একে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

২। আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা। আর মুহাম্মাদ (সাঃ) হলেন আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি। তাহলে প্রতিটি মুসলিমেরই কি উচিত নয় আরবি ভাষা শিক্ষা করা যেন সে আল্লাহ এবং তার রাসূলের বাণী উপলব্ধি করতে পারে? এই কুরআন যদিও এই পৃথিবীতে বিদ্যমান, কিন্তু এর উৎপত্তি এই পৃথিবীতে হয়নি। বরং এটি সমস্ত সৃষ্টিজগতের রব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। মহান আল্লাহ নিজেই বলেন, "নিশ্চই এটি(আল-কুরআন) সেই সত্ত্বার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যিনি মহা জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।" তাহলে এটি কিভাবে হতে পারে যে একজন মুসলিম এই দুনিয়াতে অনেককিছু করার সময় পায় অথচ সে আল্লাহর পবিত্র কিতাব এবং তার রাসূলের(সাঃ) সুন্নাহ যেই ভাষায় এসেছে তা শেখার সময় পায়না? আমাদের মধ্যে অনেকেই সময়, শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করে দুনিয়াবি অনেক বিষয়াদি শেখে। অথচ সেই তুলনায় আখিরাতের বিষয়গুলো শেখার জন্য কোনো সময়ই ব্যয় করেনা। আমরা যদি সত্যকার অর্থেই আল্লাহ এবং তার রাসূলের(সাঃ) পরিচয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হই তবে আমাদের এক সেকেন্ডও দেরি করা উচিত নয় আল্লাহর কিতাব এবং তার রাসূলের(সাঃ) এর সুন্নাহর ভাষা শেখায় মনোনিবাস করায়। কুরআন এবং সুন্নাহ কতো মূল্যবান সম্পদে পরিপূর্ন। অথচ আমাদের অধিকাংশই দরিদ্র এবং বঞ্চিত থাকাকেই বেছে নেয়।

৩। কুরআন অন্যান্য সমস্ত বস্তু থেকে অনন্য এবং শ্রেষ্ঠ। অনেক আলেমই এর কারণ হিসেবে এর ভাষাকেই গণ্য করতেন। এমনকি আরবি অলঙ্কারশাস্ত্র গড়েই উঠেছে কুরআনের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো আলোচনার উদ্দেশ্যে। এই শাস্ত্র নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে কুরআন বাগ্মীতা ও অলঙ্কারবিদ্যার সর্বোচ্চ চূড়ার প্রতিচ্ছবি বহন করে। এটি রচনাশৈলীর দিক থেকে অতুলনীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবে কুরআনের এই রচনাশৈলীর সমাদর করার জন্য আগে থেকেই জানা দরকার আরবি ভাষার জ্ঞান। তাই যারা আরবি ভাষা শেখেনি তারা চিরকাল কুরআনের রচনাশৈলী ও সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হবে।

৪। আরবি ভাষায় বর্ণিত কুরআন এবং সুন্নাহ বাদেও ইসলামের অনেক সমৃদ্ধ সম্পদ রয়েছে। এই সম্পদগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কগুলো থেকে এসেছে। আরবি ভাষা না জানার কারণে আমরা নিজেদেরকে ১৪০০ বছরের ইসলামি জ্ঞান-গরিমা থেকে বঞ্চিত করছি। এই জ্ঞানের সমটুকুই ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর উপকারে এসেছে। ইসলামি মূলনীতিগুলো রক্ষা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা গড়ে উঠেছে। আর তা হয়েছে ইসলামের প্রচার প্রসারের পরপরই। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাগুলো আজও পৃথিবীর বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানে এবং মজলিসে পড়ানো হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে ইসলামের ঐতিহ্য আরো প্রচার-প্রসার হচ্ছে। পূর্ববর্তী আলেমদের অবদান না থাকলে আমরা ইসলামকে এখন যেভাবে পেয়েছি সেভাবে পেতাম না। আল্লাহ যেন তাদেরকে অগণিত পুরস্কার দান করেন, ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাদের অবদানের প্রতিদানস্বরূপ।

৫। ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু শাখা সুনির্দিষ্টভাবে আরবি ভাষাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে কিছু কিছু বিষয় ভাষাগত। এই বিষয়গুলো বুঝতে হলে আরবি ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে বিষদ জ্ঞান থাকতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই শাখাগুলোর মধ্যে রয়েছে তাফসিরশাস্ত্র, হাদিসশাস্ত্র, ফিকহশাস্ত্র,আকিদাশাস্ত্র। এর কারণ হলো ইসলামের প্রধান দুটি উৎস হলো কুরআন এবং সুন্নাহ এবং উভয়ের ভাষা আরবি। তাই এদের বাণীকে উদঘাটন করতে হলে, বিশেষভাবে কুরআনের সূক্ষ ভাষাগত অলঙ্কারের মর্ম বুঝতে হলে একজনকে অবশ্যই আরবি ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে যা এই কাজকে সম্ভবপর করবে। কারণ তাফসির কুরআনের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। হাদিসশাস্ত্র বস্তুত রাসুল(সাঃ) এর হাদিসের ব্যাখা-বিশ্লেষণ। ফিকহশাস্ত্র তেমনিভাবে কুরআন এবং সুন্নাহে বর্ণিত বিভিন্ন বিধি-বিধান ও আইন কানুনের বর্ণনা। আকিদাহ হলো কুরআন এবং সুন্নাহে বর্ণিত বিশ্বাসমালার সমষ্টি। উপরের উল্লিখিত উদাহরণগুলো থেকে সুস্পষ্ট যে এই প্রতিটি শাখা-প্রশাখা কুরআনের ভাষারই বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এবং ইসলামের বিভিন্ন শাখার আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য পাওয়াও বিরল ঘটনা নয়। কারণ একেকজন একেকভাবে

একটি আয়াত বা হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তিনি নিজে যেভাবে আয়াতটির অর্থ ও ব্যাখা বুঝেছেন সেভাবে।

৬। উমার(রাঃ) বলেন, "সুন্নাহ এবং আরবি ভাষা শিখো। কুরআন আরবি ভাষাতেই শিখো কারণ এর ভাষা আরবি।"

তিনি আরো বলেন, "আরবি শিখো কারণ এটি তোমাদের দ্বীনের অংশ। এবং শিখে নাও কিভাবে বিগত লোকদের সম্পদ(ফরয কাজগুলো) বন্টন করতে হয়। কারণ এগুলো তোমাদের দ্বীনের অংশ।"

ইমাম শাফেয়ি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে তিনি ২০ বছর যাবত আরবি ভাষা শিখেন(সবচেয়ে বিশুদ্ধ উৎসগুলো থেকে) যাতে তিনি কুরআন বুঝতে পারেন।

কিছু কিছু আলেম উল্লেখ করেন যে আরবি ভাষা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। এই বিধানের কারণ হলো কুরআন এবং সুন্নাহর জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। আর যেহেতু আরবি ছাড়া সেই জ্ঞানার্জন সম্ভব নয় সেহেতু আরবি শিখাও বাধ্যতামূলক।

জ্ঞানচর্চায় মুসলিম নারীদের অবদান

জ্ঞান চর্চায় মহিলাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[1] তিনি কুরআন, হাদীস ইসলামী আইন প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। যে আট জন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা তৃতীয়। অনেক বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবিয়ী তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। 'আসমাউর

রিজাল’ নামক গ্রন্থগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে এক হাজার সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত লেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫০ জন মহিলা। এ থেকে অনুমান করা যায় তৎকালে নারী শিক্ষার উপর কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল।[2]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর মহিলার নিকট লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করতেন।[3] বালাযুরী বলেন, আব্দুল্লাহর কন্যা আশ-শিফা ইসলামের পূর্বে লিখন পদ্ধতি শিখেছিলেন।[4] তিনি আরও বলেন, ইসলামের প্রাথমিককালে মক্কায় যে ১৭ জন লেখাপড়া জানতেন, তাদের মধ্যে ৫ জন মহিলা ছিলেন।[5] তিনি শুধু নারীদের নয় পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, বড় বড় সাহাবী ও তাবিয়ী তাঁর নিকট হতে হাদীস, তাফসীর ও জরুরী মাসায়েল শিখতেন। হাদীসে এসেছে, “আবু মুসা বলেন, আমরা রাসূলের সাহাবীগণ যখনই কোনো সমস্যায় পতিত হয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে জিজ্ঞাসা করেছি তখনই তাঁর নিকট থেকে সেই বিষয়ে ইলম্ লাভ করেছি।”[6]

অপর একজন আয়েশা যিনি সা‘দের কন্যা ছিলেন, তিনি তার পিতার নিকট লেখাপড়া শিখতেন।[7]

মহিলাদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ লাভের সঠিক, উপযুক্ত ও উত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে তাদের ঘর ও পারিবারিক পরিবেশ। এ কারণে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রথমত পিতা-মাতা ও স্বামীর ওপর অর্পণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একখানা নির্দেশের ভাষা এই- “তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট চলে যাও, তাদের সঙ্গে বসবাস কর, তাদের জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য তাদেরকে আদেশ কর।”[8]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূণ্যশীলা স্ত্রীগণ সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। মহিলা সাহাবীগণও শিক্ষিত ছিলেন। তাদেরই প্রজ্জ্বলিত শিক্ষার আলো সমস্ত মুসলিম জাহানের

মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।[9] মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের[10] পর তার অনুসারীগণ, ইসলামের খলিফাগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্রাটগণ মানুষের মাঝে ইসলামের মহাত্মা প্রচারকে সার্থক করে তোলেন। সমাজের উন্নতি ত্বরাণ্বিত করার মানসে নারীরা পুরুষদের সাথে তাদের কর্তব্য পালনে কর্মসূচী গ্রহণ করেন।[11]

পুরুষরা যেভাবে শিক্ষিত ও জ্ঞানী গুণী হয়ে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক হয়েছিলেন, যেভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিতে নিবেদিত প্রাণ হয়ে গবেষণা করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা, তারকারাজীর তত্ত্ব ও তথ্যসহ অন্যান্য বিষয় আবিষ্কার করে তাদের মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন, তেমনই পুরুষের সঙ্গে নারীরাও শিক্ষিত হয়ে সাহিত্যি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের অনন্য অবদান রেখে গেছেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে আরব জাহানে ইসলামের অনেক প্রতিভাবতী মহিলার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, যা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ। তাদের মধ্যে উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা অন্যতম। প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও ফারুকে আযম উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তার সিদ্ধান্তকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন। শিফা বিনতে আব্দিল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এর সিদ্ধান্তকে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অনুমোদন করতেন। তিনি মহিলা বিষয়ক কোনো কোনো সরকারি কাজের দায়িত্ব শিফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে দিতেন।

কুরআনের তাফসীর বর্ণনা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনায়, হাদীসের ব্যাখ্যায় সারা বিশ্বে মুসলিম জননীগণ বিশেষতঃ উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সমস্ত মহিলা সাহাবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-দের তুলনায় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।[13]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ২২১০ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন[14]। আর ৩৭৮ খানা হাদীস উম্মূল মু'মিনীন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মে হানী এবং ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফিকহ বিদ্যায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক এত অধিক ফাতওয়া রয়েছে, যা একত্রিত করলে বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে।[15]

অনুরূপ উম্মে সালমা কর্তৃক বর্ণিত ফাতওয়াসমূহও একখানা পুস্তিকার আকার পেতে পারে। ফারায়েয বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ও অন্যান্য মহিলা সাহাবী হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, ফারায়েয, কিরাআত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তারা অনেকে কুরআনের হাফিযা ছিলেন।[16]

হিন্দ বিনতে উবায়েদ, উম্মে ইমাম বিনতে হারিসা, রাবিতা বিনতে হায়্যান, উম্মে সা'দ ইবনে রবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা সাহাবী পবিত্র কুরআনের বেশিরভাগ আয়াতের হাফিযা ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্-কুরআনুল কারীম দারস দিতেন। সহীহ্ মুসলিমের শেষাংশে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক তাফসীরের কতকাংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে শুরাইক রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, লায়লা বিনতে কায়েস, খাওলা বিনতে তবীব, উম্মে দারদা, আতিকা বিনতে যায়েদ, সাহল বিনতে সুহাইল, ফাতিমা বিনতে কায়েস, যায়নাব বিনতে আবু সলিমা, উম্মে আয়মান, উম্মে ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ যথাক্রমে

পূণ্যশীলা মুসলিম জননীগণ, খাতুনে জান্নাত এবং মহিলা সাহাবীগণও বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা একত্রিত করলে কয়েকখান সুবৃহৎ গ্রন্থ হতে পারে। মজলিসে বয়ান ও বক্তৃতায় আসমা বিনতে সাকান রাদিয়াল্লাহু 'আনহা যশস্বী ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আসমা বিনতে উমায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা অনন্য ছিলেন। তাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে কুলসুম বিনতে উক্‌বা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, করীমা বিনতে আল্‌-মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ভাল লেখাপড়া জানতেন এবং তারা গভীর জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন।

মুসলিম মহিলাগণ সাহিত্য চর্চায়ও অগ্রগামী হয়ে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। অবশ্য ইসলামী যুগ থেকে আরবের নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সাহিত্য সাধনায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। সেখানে জাকজমকের সাথে কবিতার মজলিস বসতো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহা নিজে কবিদের আসরে প্রধান অতিথি হতেন অথবা সভাপতির আসন গ্রহণ করে আসরে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তার সুযোগ্য কন্যা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কবিতা রচনা করতেন। তিনি বহু কবিতা কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতেন। অন্যদের মধ্যে খানসা, সওদা, সুফিয়া, আতিকা, উমামা, মুরদিয়া, হিন্দ বিনতে হারিস, যয়নাব বিনতে আওয়ান, আতিকা বিনতে যায়েদ, হিন্দ বিনতে আনাস, উম্মে আয়মান, করিলা, আবদারিয়া, কসবা বিনতে রাফে, মায়মূনা, বালাবিয়া, নেয়াম, রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা কবিতায় অতিশয় খ্যাতি লাভ করেন। খানসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এর মত প্রতিভাবান মহিলা কবি সে যুগে পৃথিবীর বুকে বিরল। তার কবিতা পুস্তকাকারে ছাপানো হয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বিদূষী কবি, ঐতিহাসিক ও একজন শক্তিশালী বক্তা ছিলেন। কেবলমাত্র তাঁর বহুমুখী প্রতিভা বিভিন্ন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি ও বর্ণনা থেকে নিয়ে তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।[18]

মুসলিম নারী ও পুরুষগণ উভয়েই সাধারণ শিক্ষার পর অনেকেই কারিগরী বিদ্যার বিভিন্ন শিল্প কাজে ও বাণিজ্যে, সেলাইয়ের কাজে, দ্রব্যশিল্পে, চামড়া রং এর কাজে, পশু

পালনে,এমনকি হিসাব কিতাবে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ঐ সময়ে প্রায় সকল আরব মহিলা সাধারণভাবে নিজ নিজ কাজে মহিলারা অভিজ্ঞ ছিলেন। মুসলিম জননী সওদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা তায়েফের চামড়া প্রস্তুত করার পদ্ধতি জানতেন।[19]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলে আরবের প্রায় সমস্ত তীব্ব বিদ্যার বিশেষজ্ঞরা তাঁর চিকিৎসার ব্যাপার যা আলোচনা করতেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা তাই মনে রাখতেন। এই সময়ে ইবনে বালদা লতা-পাতা দ্বারা বর্তমান যুগের কবিরাজ হেকিমদের মত রোগের চিকিৎসা জানতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সংশ্রবে থেকে মুসলিম জননী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বিভিন্ন রোগের ওষুধ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে পরবর্তীকালে তা মুসলিম মহিলাগণকে শিক্ষা দেন। মহিলাগণ যাঁরা ইলমে তীব্ব ও রোগী শুশ্রুষায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, তাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুজাহিদ সৈন্যদের সেবা-শুশ্রুষার কাজেও নিয়োগ করা হতো।[20] সাহাবী উরওয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেছেন, ''আমি উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে অন্য কোনো মহিলাকে ইলমে তীব্ব ও অস্ত্রপচার বিদ্যার অতীব পারদর্শী হতে দেখিনি।[21]

মহিলা সাহাবীগণ তাঁদের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, উপলব্ধি ও দূরদৃষ্টি বলেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি মুসলিম জাতিকে দিক নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়িম (র.) বলেছেনঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে সকল সাহাবীর ফতোয়া সংরক্ষিত আছে তাঁদের সংখ্যা একশত ত্রিশের কিছু বেশী হবে। এদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তাঁদের মধ্যে আবার সাতজনের ফতোয়ার সংখ্যা এত বেশী যে, আল্লামা ইবনে হাযমের মতে তাদের ফতোয়াগুলো পৃথকভাবে একত্র করলে প্রত্যেকেরই একটি করে বিরাট গ্রন্থ

হয়ে যাবে। এই সাতজনের মধ্যে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর মত ব্যক্তির সাথে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাও অন্তর্ভুক্ত।

ফতোয়া দানকারী সাহাবীদের দ্বিতীয় সারিতে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর সাথে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর মত মহিলা সাহাবীও রয়েছেন।

ফতোয়া দানকারী তৃতীয় আরও একদল সাহাবী আছেন। তাঁদের ফতোয়ার সংখ্যা খুব কম। এসব সাহাবীদের মধ্যে হাসান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, আবূ যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু প্রমুখের মত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। এই দলের মধ্যে উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, লায়লা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, আসমা বিনতে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে শরীফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, খাওলা বিনতে তাওরীত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, মায়মূনা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে আয়মান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, গামিদিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রমুখ মহিলা সাহাবীগণও অন্তর্ভুক্ত আছেন।[22]

জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য ছোট ও বড় নারী ও পুরুষ এবং কাছের ও দূরের সব রকমের লোকই মহিলা সাহাবীদের শরণাপন্ন হয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ এসব মহীয়িসী নারীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে তাদের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। নিজেদের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করার

উদ্দেশ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কাছে কত লোক যে আসা-যাওয়া করতো আয়েশা বিনতে তালহার বর্ণনা থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন:

كان الناس يأتونها من كل مصر.

“প্রত্যেক শহর ও জনপদ থেকেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কাছে লোক আসতো।”[23]

হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উমর, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর মত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী সাহাবীদের ইজতিহাদী রায়েরও সমালোচনা করে তাঁদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

সাহাবীদের মধ্যে হাদীসের অনেক বড় বড় হাফিয ছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-ও তাঁদের একজন। আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ছাড়া আর কোনো সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত অধিক নয়।

আবূ মূসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর মত পণ্ডিত ও ফিকহবিদ সাহাবীও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজের এবং তাঁর মতই আরও অনেকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেনঃ

ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائسة إلا وجدنا عندها منه علما.

“আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীরা কোনো হাদীস নিয়ে সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-কে জিজ্ঞাসা করতাম এবং তাঁর কাছ থেকে সে ব্যাপারে কোনো না কোনো জ্ঞান অবশ্যই লাভ করতাম।”[25]

উম্মূল মু’মিনীন, আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ইসলামী জ্ঞানে ছিলেন অদ্বিতীয়া। এমনকি প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবী কাব্য সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। উরওয়া বলেন, তাঁর মত অধিক কবিতা মুখস্থকারী আমি আরবে আর কাউকে দেখিনি। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে দ্বিতীয়া। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০।

মদীনার বিখ্যাত ফকীহ্ উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস কাসিম ইবনে মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে ইমাম ইবনুল ইমাদ আলহাম্বলী লিখেছেন, “যাঁরা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করেছেন এরা দু’জনও তাদের শামিল। তারা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর মত ও সিদ্ধান্ত কখনো অগ্রাহ্য করতেন না, বরং তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করতেন।”[26]

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, “আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে অনেক কিছু স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। মানুষ তাঁর কাছে থেকে অনেক কিছু জানতে ও শুনতে পেরেছেন এবং অনেক হুকুম-আহকাম ও আদবের কথা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, শরীয়তের এক চতুর্থাংশ আহকাম তাঁর থেকেই বর্ণিত হয়েছে।”[27]

হাফিয ইবনে হাজার (র.) অন্য এক স্থানে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে হাদীস বর্ণনাকারী অষ্টাশিজন লোকের নাম উল্লেখ করার পর লিখেছেন যে, এসব ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও

বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে আছেন আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, আবূ মূসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর মত রাজনীতিবিদ এবং আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর মত মুহাদ্দিস ও ফকীহ। এদের সাথে আরও রয়েছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের মত খ্যাতনামা তাবি‘য়ী এবং আলকামা ইবনে কায়েসের মত নামজাদা ফকীহ। তাঁদের মধ্যে যেমন স্বাধীন মানুষ এবং ক্রীতদাস ছিলেন, তেমনি ছিলেন নারী ও পুরুষ।[28]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর অসাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে ইমাম যুহরী বলেন, ‘‘যদি সকল মানুষের জ্ঞান এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য পত্নীগণের জ্ঞান একত্র করা হয়, তাহলে এককভাবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর জ্ঞান হবে তাদের সকলের জ্ঞানের তুলনায় অধিকতর প্রশস্ত ও ব্যাপক।’’[29]

ইমাম যুহরী (র.) অন্যত্র বলেছেন, ‘‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বড় বড় সাহাবীগণও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন।’’[30]

প্রখ্যাত আলেম বদরুদ্দীন যারকাশী (র.) একখানা কিতাব রচনা করেছেন, যাতে একটি বিষয়ই সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তা হলো, ‘‘অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের মোকাবেলায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর ভিন্ন মতসমূহ।’’ কিতাবের নাম দিয়েছেন- ‘‘আল্-ইজাবাহ্ লিঈরাদি মাস্তদরাকাৎহু আয়িশা ‘আলাস্ সাহাবাহ্’’। তিনি এ কিতাবের ভূমিকায় বলেছেন, এ কিতাবটিতে আমি এমন সব কথা সংকলিত করেছি যে ব্যাপারে আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রমী মত ব্যক্ত করেছেন বা বিরোধী মত পোষণ করেছেন অথবা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট পদ্ধতি তাঁর জানা ছিল কিংবা নিশ্চিত জ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন। অথবা সে বিষয়ে তিনি সমকালীন আলিমগণের মতামত অগ্রাহ্য করেছেন,

কিংবা তাঁর মতের দিকে সমসাময়িক আলিমগণের একটা বড় অংশ ফিরে এসেছেন। অথবা ফতোয়া প্রদান করে সে বিষয়টি তিনি মুক্ত করেছেন বা স্বীয় ধারণা অনুযায়ী শক্তিশালী মতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করেছেন।

উমর ইবনু খাত্ত্বাব, আলী ইবনু আবূ তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম এবং এঁদের মত ২৩ জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম-এর সাথে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বিভিন্ন বিষয়ে যে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, ইমাম যারকাশী এ কিতাবে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। এসব মতামতের সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

'আল্-ইজাবাহ্' কিতাবের ব্যাখ্যাতে বিশিষ্ট আলিম সাঈদ আল্-আফগানী বলেছেন, ''আমি কয়েক বছর যাবত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর জীবন সংক্রান্ত গবেষণার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তাঁর মধ্যে এমন অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েছি যা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। বিশেষ করে তাঁর জ্ঞান ছিল সমুদ্রতুল্য। জ্ঞানের দিগন্তে তিনি ছিলেন সমুদ্রবক্ষে উদ্বেলিত ঢেউয়ের মত। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তাঁর মধ্যে যে বিষয়ের জ্ঞানেরই সন্ধান করতে চান না কেন, চাই তা ফিকহ, হাদীস, তাফসীর, ইসলামী বিধান, সাহিত্য, কবিতা, ঘটনাপঞ্জী, বংশ তালিকা, গৌরবগাঁথা, চিকিৎসা বা ইতিহাস, যাই হোক না কেন, আপনি তাঁর মধ্যে সব বিষয়ের সমাবেশ দেখতে পাবেন। এ ব্যাপারটা আপনাকে দস্তুরমত হতবাক করে দেবে। আপনি আরও অবাক হবেন, যখন দেখবেন এসব বিষয়ে তাঁর পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতা এমন সময়ে হয়েছিল যখন তাঁর বয়স আঠার বছর অতিক্রম করে নি।''[31]

উম্মূল মু'মিনীন সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর জ্ঞান ভাণ্ডার হতে মুসলিম উম্মাহ্ কি পরিমাণ লাভবান হয়েছে তা মুহায়রা বিনতে হুদায়রের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, হজ্জ আদায় করার পর আমরা কয়েকজন মহিলা মদীনায় গিয়ে সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর খিদমতে হাযির হলাম। সেখানে পৌঁছে আমরা দেখতে পেলাম যে,

কূফার কিছুসংখ্যক মহিলা পূর্বেই তাঁর খিদমতে বসে আছে। আমরা তাঁকে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় এবং হায়েয ও নাবীযের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। এভাবে কত জায়গায় কত মানুষ যে তাঁর নিকট হতে শত শত মাসআলা জেনে নিয়েছে তার সীমা সংখ্যা নেই।[32]

উম্মূল মুমেনীন উম্মে সালামার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এরূপ বত্রিশজন রাবীর নাম বর্ণনা করার পর হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেনঃ এ ছাড়া আরও অনেক লোক তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিখ্যাত সাহাবী ও তাবি‘ঈ উভয় শ্রেণীর লোকই রয়েছেন।[33]

মারওয়ানের একটি জরুরী বিষয় জানা প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি বলেনঃ

كيف نسأل أحدا وفينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

‘‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র পত্মীগণ আমাদের মাঝে বর্তমান থাকতে আমরা কোনো বিষয় সম্পর্কে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করতে যাব কেমন করে? তাই তিনি লোক মারফত উম্মে সালামাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন। তিনি তার সে সমস্যার সামাধান করে দেন।[34]

সাহাবীগণের ‘ইলমী মতপার্থক্য দূরীকরণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীগণ বিরাট ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন। ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (র.) বলেনঃ

‘‘সাহাবীগণের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হলে এবং উম্মুল মু‘মিনীনদের কেউ সে বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করলে, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করতেন এবং নিজেদের সমস্ত মতপার্থক্য পরিত্যাগ করে তা আঁকড়ে ধরতেন।’’

রুবাই‘ বিনতে মু‘আওয়ায রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবী ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা জানার জন্য আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরও কখনো কখনো তাঁর নিকট হাযির হতেন। এ থেকেই তাঁর জ্ঞানের মর্তবা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।[36] রুবাই‘ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একুশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে আয়েশা বিনতে মালিক, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান, নাফে‘, উবাদ ইবনুল ওয়ালীদ, খালিদ ইবনে যাকওয়ান, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে আকীল, আবূ উবায়দা ইবনে মুহাম্মদ এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম প্রমুখ রয়েছেন।[37]

ফাতিমা বিনতে কায়েস একজন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে চৌত্রিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর হাদীসের রাবীদের মধ্যে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান-এর মত সাহাবীগণ রয়েছেন। এছাড়া সুলাইমান ইবন ইয়াসার এবং শা‘বীর মত উচ্চ মর্যাদার তাবি‘ঈগণও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে শামিল আছেন।

উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র.) লিখেছেন,

‘‘তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যার জানাযার গোসলে শরীক ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর বর্ণিত হাদীসই মূলভিত্তি। সাহাবা এবং বসরার তাবি‘য়ী আলিমগণ তাঁর নিকট থেকেই মৃতকে গোসল দেয়ার নিয়ম-কানূন শিখেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর থেকে আনাস ইবনে মালিক, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন এবং হাফসা বিনতে সিরীন বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।’’

সা'আদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাসের কন্যা আয়েশা এর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মালিক, আইয়ূব সাখতিয়ানী এবং হিকাম ইবনে উতায়বার মত ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণও রয়েছেন।[39]ইমাম শাফে'য়ী (র.) হাসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর নাতনী সাইয়িদা নাফিসা (র.)-এর কাছে গিয়ে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।

যুগে যুগে আরবী ভাষা সংরক্ষণে নারীর ভূমিকা

প্রাক-ইসলামী যুগ থেকেই নারীরা আরবি ভাষার সেবা ও সংরক্ষণের চেষ্টা করেছে। এটি সাংস্কৃতিক দৃশ্যের মানুষের সাথে তার মিথস্ক্রিয়া এবং সংবাদ, উপন্যাস এবং কবিতার সাথে তার অবদানের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়কালে অনুষ্ঠিত সাহিত্যের বাজারগুলি এমন একটি মঞ্চ ছিল যেখানে মহিলারা তাদের ভূমিকাকে সবচেয়ে ভালভাবে মূর্ত করে তোলেন। কবি আল-খানসা রা. তার কবিতা রচনার মাধ্যমে এটির সর্বোত্তম সাক্ষী হতে পেরেছিলেন, যা তার ভাষার উপর দক্ষতা এবং এমনকি অনেক কবিদের কাছে তার শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করে। তার সময় তাদের ভাষার মহিমা ও শক্তিতে আরবদের গর্বের যুগ।

ইসলাম যখন এসেছিল, তখন এটি ইসলামের মহৎ চেতনার সাথে পরিমার্জিত করার পরে এটি নারীদের ভাষাকে একটি সুন্দর কমনীয়তা এবং বিস্ময়কর কমনীয়তা দিতে সক্ষম হয়েছিল, তাই এটি নোবেল কুরআনে স্পষ্ট করা ওহীর ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এর বর্বরতা এবং অদ্ভুততা থেকে এটিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। 'একটি এবং শুদ্ধ সুন্নাহ, এবং মুমিনদের মা আয়েশা - তার উপর সন্তুষ্ট হতে পারে - তাদের সামনে, সম্মানিত তার বর্ণনার মাধ্যমে; তিনি দুই হাজার দুই শতাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন, এইভাবে তার অমর আরবি ভাষা সংরক্ষণ করেছেন, এবং ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে বিবেচিত মহৎ গ্রন্থগুলি বর্ণনা করেছেন এবং কোন ভাষা? এটি সবচেয়ে বাগ্মী আরব, মুহাম্মদ সা.

এর দ্বারা কথিত বাকপটু ভাষা - তিনি তাতেই থেমে যাননি, বরং - ঈশ্বর তার প্রতি সন্তুষ্ট হন - তিনি একটি সুন্দর শব্দ এবং একটি দুর্দান্ত বক্তব্যের মালিক ছিলেন। আসুন আমরা তাকে তার পিতার জন্য তার প্রশংসার এই অংশটি পড়ি যখন তিনি বলেছিলেন: "আপনি এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং পরকালের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল।" নবী-সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এবং অনেক মুসলিম নারী সেই যুগে ভাষার উপর নারীদের দক্ষতা এবং তাদের সংরক্ষণের প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

যখন ইসলামিক স্টেট বিস্তৃত হয় এবং এর এলাকা বিস্তৃত হতে থাকে, তখন আরবি অন্যান্য ভাষার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়। আরবরা অনেক অনারবদের সাথে মিশে যাওয়ার পরে এটি ঘটেছিল এবং সুরটি আরবি ভাষার লোকেদের ভাষায় আবির্ভূত হয়েছিল, যা এটির মতবাদের লোকেরা এর নিয়ম সীমাবদ্ধ করার এবং প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থগুলির এক্সট্রাপোলেশনের মাধ্যমে এর বাক্যগুলি নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করেছিল। সুতরাং ব্যাকরণের জ্ঞান "আবু আল-আসওয়াদ আল-দুআলি"-এর হাতে এসেছিল তাদের মতামত অনুসারে যারা ভেবেছিলেন যে তিনি এই জ্ঞানের রচয়িতা সেই চিন্তার ফলস্বরূপ এবং তার কারণগুলির মধ্যে একটি ব্যাকরণের জ্ঞান সৃষ্টির ঘটনাটি ঘটেছিল তার এবং তার মেয়ের মধ্যে, এবং এটি ছিল যখন সে তার বাবাকে এক রাতে জিজ্ঞাসা করেছিল, এবং সে বলেছিল: আকাশ কত ভাল? তিনি "সুন্দর" শব্দটিতে সন্ন্যাসীকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং তার বাবা বলেছিলেন: "আমি এটি চাইনি, তবে আমি এর সৌন্দর্যে অবাক হয়েছিলাম।" আকাশটা সুন্দর!" নুন খোলার সাথে সাথে, তারপর ব্যাকরণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং এটি থেকে প্রথম জিনিসটি ছিল বিস্ময়ের অধ্যায়, এবং এই বর্ণনা থেকে আমরা জানি যে মহিলার দক্ষতা এবং তার ভাষায় দক্ষতা কতটা ছিল এবং সম্ভবত তিনি এর কারণ ছিলেন। এই বর্ণনা অনুসারে ব্যাকরণ বিজ্ঞানের আবির্ভাব। সময়ের সাথে সাথে মহিলাটি তার ভাষা বজায় রাখে এবং এতে দক্ষ হয়। উমাইয়া যুগে, আমরা দেখতে পাই মহান কবি "আল-ফারাজদাক" তার স্ত্রী "নাওয়ার" এর সাথে তার এবং "জারির" এর মধ্যে কবিতা নিয়ে সালিশ করছেন। “আল-বায়ান ওয়াল-তাবিয়ীন”

গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি তার স্ত্রীকে বললেনঃ তুমি জারীরকে কিভাবে দেখেছ? সে বললো: আমি দেখেছি যে তুমি প্রথমে তার সাথে অন্যায় করেছিলে, তারপর তুমি তার থেকে দূরে সরে গেলে সে বললো: আমি তার প্রেমিক। তা হল: দুর্বল এবং দুর্বল তিনি বলেছেন: হ্যাঁ, তবে তিনি আপনাকে এর মাধুর্যে পরাজিত করেছেন, এবং এটি একটি মহিলার কবিতা বোঝার, এটির সমালোচনা এবং এর শব্দগুলির পার্থক্যের ইঙ্গিত দেয়।

আব্বাসীয় যুগে, সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের যুগ যা শতাব্দী ধরে চলেছিল, নারীরা এতে উপস্থিত ছিল, যদিও নগরায়ন এবং নগরায়নের জীবন নারীদের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল, তাই অনেক মহিলা আবির্ভূত হয়েছিল যারা পেশাদার গায়ক ছিলেন এবং তারা প্রচারে অবদান রেখেছিলেন। সেই বিলাসবহুল সমাজে মানুষের মধ্যে অনেক মিষ্টি আরবি কবিতার আবির্ভাব ঘটেছিল, যেমন আলিয়া আল-মাহদিয়া এবং রাবিআ আল-আদাবিয়া, যারা মিষ্টি কবিতা লিখেছিলেন, যাদের কথা ছিল সহজ এবং যাদের সঙ্গীত ছিল সুসংগত। তার কবিতা রচনার উদ্দেশ্য।

আন্দালুসিয়ার গ্রানাডায়, কবি হামদা বিনতে জিয়াদ বিন তাকি তার সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত কবি ছিলেন, তাই তাকে মরক্কোর খানসা বলা হত তার সম্পর্কে বর্ণিত।

আধুনিক যুগে, মহিলারা স্পষ্টভাবে আবির্ভূত হয়েছিল, এবং স্বাধীন কবিতা সংকলনে আরবি কবিতা লিখে, বা সেই সময়ে প্রকাশিত সংবাদপত্রে সাহিত্যিক নিবন্ধ লিখে তাদের ভাষা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল: নাজিক আল-মালাইকা, যাকে আধুনিক যুগে মুক্ত কবিতার পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, আমরা যারা মুক্ত কবিতার অস্তিত্ব স্বীকার করি বা প্রত্যাখ্যান করি, কবি নাজিক আল-মালাইকা ইরাকের আধুনিক কবিতার পথিকৃৎ এবং অবদানকারী। কবিতার মাধ্যমে ভাষা সংরক্ষণের জন্য, যে ভূমিকাটি লেখক মে জিয়াদেহ পালন করেছিলেন ... তার কবিতার রচনা, তার নিবন্ধ লেখা, আধুনিক যুগের প্রধান লেখকদের সাথে তার সাহিত্যিক চিঠিপত্রের আদান-প্রদান এবং তার সাহিত্যচর্চা তার

অনেক গবেষণায় সমালোচনাও উল্লেখযোগ্য নামগুলির মধ্যে: "বিন্ত আল-শাতি" ডঃ "আয়েশা আবদেল রহমান ," লেখক, চিন্তাবিদ, অধ্যাপক এবং গবেষক, এবং তিনি আল-আজহার আল-এ বক্তৃতা করা প্রথম মহিলা। -শরীফ আরবি সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টার জন্য 1994 সালে আরবি সাহিত্যের জন্য বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং ড. সুহাইর আল-কালামাভি, একজন গবেষক, লেখক এবং সাহিত্য সমালোচক। মেয়েটি 1937 খ্রিস্টাব্দে খারিজি সাহিত্যের উপর তার থিসিসের জন্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছিল এবং সে তার আরবি ভাষার সেবায় ব্যাপক অবদান রেখেছিল।

আমাদের সৌদি সাহিত্যে, নারী ছিলেন সংবাদ, গল্প এবং কবিতার কথক , প্রাচীন কাল থেকেই পরিবেশ ও প্রচলিত সংস্কৃতির কারণে তিনি তা করতে প্ররোচিত হয়েছেন। সোরায়া কাবিল, সাহিত্যের বিশ্বে একটি নাম হতে পেরেছিলেন যাকে মহান লেখক, মুহম্মদ হাসান আওয়াদ, " বিংশ শতাব্দীর খান" হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।

আজ, মহিলারা বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষাদানের মাধ্যমে, পবিত্র কোরআন, নোবেল হাদিস এবং তাদের বিজ্ঞান এবং আরবি ভাষার বিজ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার ভাষা পরিবেশন করার জন্য একটি সম্মানজনক অবস্থান গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল এবং স্মৃতিচারণ কেন্দ্রগুলিতেও মহিলারা স্বাধীন বইয়ে, বা আমাদের বিশেষ সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনের মাধ্যমে কবিতা রচনায় তাদের ভূমিকা পালন করে, যেখানে মহিলারা তাদের লেখা প্রকাশ করে। সুন্দর আরবি ভাষায়।

এই ভাষা শিক্ষা ও প্রসারে নারীদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে, কারণ এটি কুরআন ও সুন্নাহর ভাষা এবং বক্তব্য ও প্রজ্ঞার ভাষা, এবং নারীরা যখনই এটি সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুভব করেন তখনই এটি করতে সক্ষম। জ্ঞানের বিস্তার, সংস্কৃতির মিলন এবং প্রভাবের প্রাচুর্যের সময়ে আরবি ভাষা।

আরবি ভাষা শেখার কৌশল

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা মুসলমানদের জন্য অপরিসীম। যেহেতু আমরা বাঙ্গালী তাই আরবি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে অনিহা দেখা দিতে পারে তাই আরবি ভাষা শেখার দারুন কিছু কৌশল নিচে দেয়া হলো। যে কৌশল গুলো অবলম্বন করলে খুব সহজেই আরবি ভাষা শেখা যায়।

আমাদের লক্ষ্য এবং প্রেরণা ঠিক করা:

আরবি ভাষা শেখা শুরু করার আগে, আমরা কেন আরবি শিখতে চান তা নির্ধারণ করা। আমাদের লক্ষ্য পরিবর্তিত হতে পারে, যেমন যোগাযোগের উন্নতি, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি, বা পেশাদার সুযোগ প্রসারিত করা। তারপরে অনুপ্রেরণা খোঁজা যা আমাদের শেখার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে, উদাহরণস্বরূপ, আরবি ভাষা আয়ত্ত করার সুবিধাগুলি কল্পনা করা।

একটি নিয়মিত সময়সূচী সেট করা:

স্ব-নির্দেশিত শিক্ষার জন্য ধারাবাহিকতা এবং নিয়মিততা প্রয়োজন। আমাদের জন্য সুবিধাজনক একটি অধ্যয়নের সময়সূচী স্থাপন করা এবং এটিতে লেগে থাকা। এটি আমাদেরকে আমাদের পড়াশোনায় আগ্রহ এবং অনুপ্রেরণা বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

লিখিত এবং কথ্য ভাষা অনুশীলন করা:

আরবীতে আমাদের যোগাযোগের দক্ষতা বিকাশের জন্য, লিখিত এবং কথ্য উভয় ভাষা অনুশীলন করা অপরিহার্য। একটি আরবি ডায়েরি রাখা, অন্যান্য ছাত্র
বা স্থানীয় ভাষাভাষীদের সাথে যোগাযোগ করা, আলোচনায় অংশগ্রহণ করা, অথবা এমনকি একজন শিক্ষকের সাথে অনলাইন পাঠের জন্য সাইন আপ করা যেতে পারে।

শ্রবণ দক্ষতার উপর কাজ করুন:

অডিও পাঠ, পডকাস্ট, সংবাদ সম্প্রচার, বা আরবীতে বিভিন্ন প্রকার ভিডিও দেখার মাধ্যমে আমাদের শোনার দক্ষতা উন্নত করা। এটি আমাদেরকে নেটিভ স্পিকারগুলিকে আরও ভালভাবে বুঝতে এবং আমাদের সামগ্রিক বোঝার উন্নতি করতে সহায়তা করবে।

প্রযুক্তি এবং অ্যাপ ব্যবহার করা:

আধুনিক প্রযুক্তি এবং মোবাইল অ্যাপ আরবি শেখার প্রক্রিয়াকে উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ করতে পারে। ইন্টারেক্টিভ ব্যায়াম, গেমস এবং অডিও পাঠ অ্যাক্সেস করতে Duolingo, Memrise বা Babbel এর মত ভাষা শেখার অ্যাপ ব্যবহার করা যেতে পারে যা আমাদেরকে আমাদের আরবি দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

বাক্যাংশগুলি শেখা, কেবলমাত্র পৃথক শব্দ নয়:

বাক্যাংশগুলি অধ্যয়ন করা আমাদেরকে কীভাবে প্রসঙ্গে শব্দগুলি ব্যবহার করতে হয় এবং সেগুলি বক্তৃতায় কীভাবে ব্যবহার করা হয় তা বুঝতে সহায়তা করে। আমাদের স্মৃতিতে সিমেন্ট করার জন্য নতুন শব্দ দিয়ে বাক্য এবং বাক্যাংশ তৈরি করা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সেগুলি ব্যবহার করতে শেখা।

ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা:

যদিও স্ব-নির্দেশিত আরবি শিক্ষা প্রায়শই শব্দভান্ডারের উপর ফোকাস করে, ব্যাকরণ অধ্যয়ন করতে ভুলব না। ব্যাকরণের নিয়মগুলির সঠিক বোধগম্যতা আমাদের সুসংগত এবং সুনির্দিষ্ট বাক্য তৈরি করতে সাহায্য করবে, আমাদের বক্তব্যকে আরও বোধগম্য এবং পেশাদার করে তুলবে।

ক্রমাগত আমাদের শব্দভান্ডার প্রসারিত করা:

আমরা ইতিমধ্যে যা অর্জন করেছি তার জন্য স্থির হব না; শেখার জন্য সর্বদা নতুন

শব্দ এবং অভিব্যক্তি সন্ধান করা। প্রতিশব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ এবং বিভিন্ন উপায়ে শব্দগুলি আমাদের শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে এবং যোগাযোগে আরও অভিব্যক্তিপূর্ণ এবং সৃজনশীল হতে ব্যবহৃত হয়। শেখার প্রক্রিয়া উপভোগ করা: স্ব-নির্দেশিত আরবি শেখা আনন্দদায়ক হওয়া উচিত। আকর্ষণীয় বিষয় অধ্যয়ন করা, সৃজনশীল শেখার পদ্ধতি ব্যবহার করা এবং পরীক্ষা করতে ভয় না পাওয়া।

যখন শেখা আনন্দদায়ক হয়, তখন আমরা আমাদের ভাষার লক্ষ্য অর্জনে আরও অনুপ্রাণিত এবং সফল হব ইন শা আল্লাহ।

ভাষা শেখার সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত থাকা:

অনলাইন সম্প্রদায় বা ফোরামে যোগ দেয়া যেতে পারে, যেখানে শিক্ষার্থীরা আরবি শেখার সাথে যোগাযোগ করে। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ আমাদের সহায়তা প্রদান করবে, আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং পরামর্শ ভাগ করার অনুমতি দেবে।

নিজেকে চ্যালেঞ্জ করা:

সক্রিয় শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে ছোট চ্যালেঞ্জ এবং কাজগুলি সেট করা। উদাহরণস্বরূপ, প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক নতুন শব্দ শেখার বা অডিও পাঠের একটি সংখ্যা শোনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা। এটি আমাদেরকে আমাদের ভাষার লক্ষ্যগুলির প্রতি আগ্রহ এবং অগ্রগতি বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

আরবি ভাষা শিক্ষার কিছু গ্রন্থ

আরবী ভাষা শিক্ষার কিছু জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক কিতাবের নাম উল্লেখ্য করা হলো:

১.العربية للناشئين

২.العربية بين يديك

৩.العربية بين يدي أولادنا

৪.أهداف تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

৫.سلسلة " علمني العربية " لتعليم العربية لغير الناطقين بها

৬.كتاب " لسان " لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

বাংলাদেশে আরবী ভাষা শিক্ষার জনপ্রিয় কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ্য করা হলো:

১. এসো আরবী ভাষা, লেখক মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ

২. আত তামরীনুল কিতাবি, লেখক মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ

৩. রওজাতুল আদব, লেখক

৪. দারসুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, লেখক নাজমুল হাসান

৫. আরবী ভাষা শিক্ষা, লেখক মু. অছিউর রহমান

৬. আল মুকাররারাতুল মুফিদাহ, লেখক মাওলানা মহিউদ্দিন ফারুকী

আরবি ভাষা কম্পিউটারের সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যিনি

বিশ্বে প্রথমবার সফটওয়ারের সাহায্যে কম্পিউটারে আরবি ভাষা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আল-শারিখ। এর মাধ্যমে অনলাইনে পবিত্র কোরআনসহ অসংখ্য হাদিসগ্রন্থ সংরক্ষিত হয়। গত বুধবার (৬ মার্চ) রাতে ৮২ বছর বয়সে কুয়েতে ইন্তেকাল করেন তিনি।

এক বিবৃতিতে তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছে দেশটির সংস্কৃত, শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক জাতীয় কাউন্সিল।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘প্রয়াত শায়খ আল-শারিখ ছিলেন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের অন্যতম, যিনি আরবি ভাষা ও সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যকরণ থেকে সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তা ছাড়া আশির দশকে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কম্পিউটারে আরবি

ভাষা চালুর ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ২০১৮ সালে তিনি কুয়েতের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পুরস্কার এবং ২০২১ সালে ইসলামের সেবার জন্য সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ করেন।'

আল-শারিখ ১৯৪২ সালে কুয়েতে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৬৫ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক এবং যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের উইলিয়ামস কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কুয়েত উন্নয়ন তহবিলের সহকারী পরিচালক এবং বিশ্বব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। কুয়েত ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পরিষদের প্রধান ছিলেন।

আধুনিক প্রযুক্তিতে আরবি ভাষার সমৃদ্ধি আনতে আল-শারিখ সাখর প্রজেক্ট প্রতিষ্ঠা করেন।

এর মাধ্যমে স্ক্রিন রিডার, মেশিন ট্রান্সলেশন, অটোমেটিক স্পিসসহ আরবি ভাষার উন্নয়নে নানামুখী কাজ করা হয়। এখান থেকে তরুণদের কম্পিউটার প্রগ্রাম ও বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক বই প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি পবিত্র কোরআন, ৯টি প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ ও ইসলাম বিষয়ক তথ্যাবলি কম্পিউটার প্রগ্রামে ডেভেলপ করে।

তিনি ১৯৮২ সাল থেকে কম্পিটার প্রগ্রাম আরবিকরণ, অ্যারাবিক ইলেকট্রনিক ডিকশেনারি, প্রুফ রিডার প্রগ্রাম, অটোমেটিক ফর্মাল অ্যারাবিক প্রনানসিয়েশন, মেশিন ট্রান্সলেশন ডেভেলপ করাসহ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ভিশন সিস্টেম উন্নয়নে কাজ করেন।

সূত্র : আলজাজিরা

[কালের কণ্ঠ]

বাংলাদেশে আরবি ভাষা শেখার আগ্রহ বাড়ছে

বাংলাদেশে আগের চেয়ে আরবি ভাষা শেখার আগ্রহ অনেক গুণ বেড়েছে। একসময়ে শুধু মাদরাসাপড়ুয়ারা আরবি ভাষায় পারদর্শী হলেও এখন অনেক সাধারণ শিক্ষিত লোকও এ ভাষায় কথা বলছেন। মাদরাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এই আগ্রহ বেড়েছে। বাঙালি মুসলিম সমাজে ব্যক্তি উদ্যোগে আরবি ভাষা শেখার ঐতিহ্য থাকলেও এ ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান থাকা এখন ভাষাগত দক্ষতার অংশে পরিণত হয়েছে।

অনলাইন ও অফলাইনে গড়ে উঠেছে আরবি ভাষা শিক্ষা লাভের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। বিশেষত করোনাকাল ও পরবর্তী সময়ে অনলাইনে অসংখ্য মানুষ আরবি ভাষা শিখছে।
২০১৯ সালে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আরবি ভাষা শেখাতে সিবাওয়াই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন নাজমুল হাসান। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘গত পাঁচ বছরে তিন হাজারের বেশি শিক্ষার্থী আমাদের কাছে আরবি ভাষা শিখেছে।

তাদের বেশির ভাগই ঢাবি, বুয়েট ও ঢামেকের শিক্ষার্থী। সচিবালয়, সামরিক মিশন ও দূতাবাসের কর্মকর্তা ছাড়াও সাধারণ শিক্ষিতরা এ ভাষা শিখছে। অফলাইনে আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা থাকলেও অনলাইন ক্লাসের প্রতি আগ্রহ অনেক বেশি। শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রবল আগ্রহ ও অদম্য ইচ্ছায় তারা আরবি ভাষাকে নিজেদের আয়ত্তে আনছে।
’

ইনস্টিটিউট অব অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজের সমন্বয়ক আবু নাঈম বলেন, ‘২০২০ সালে প্রতিষ্ঠার পর এখান থেকে হাজারের বেশি মানুষ আরবি ভাষার কোর্স সম্পন্ন করেছেন। অনলাইন ও অফলাইন ক্লাস একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের সুবিধামতো ক্লাসে অংশ নিতে পারেন। মাদরাসা শিক্ষার্থী ছাড়াও বিভিন্ন পেশার মানুষ ভাষার আমাদের কাছে কোর্স করছেন।’

অনলাইনভিত্তিক ইসলামী প্রতিষ্ঠান নুরুল কোরআন অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক মুফতি আবদুল্লাহ আল-মাসউদ কালের কণ্ঠকে জানিয়েছেন, ২০২০ সাল থেকে নুরুল কোরআন অ্যাকাডেমিতে আরবি ভাষা কোর্স চালু হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার ব্যক্তি কোর্সটি করতে ভর্তি হয়েছেন যাদের সবাই জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়াশোনা করেছেন।

অনলাইন ও অফলাইন উভয়ক্ষেত্রে ক্লাস করার সুযোগ থাকলেও ব্যস্ততার কারণে অধিকাংশই অনলাইনে ক্লাস করতে চান। পাঠদান নিজেদের তৈরি সিলেবাসে হওয়ায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ছে বলে মনে করেন তিনি।
সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে ২০২৩ সালে টেন মিনিট স্কুল চালু করে সহজে স্পোকেন আরবি কোর্স। এক বছরেই প্রায় দুই হাজার জন কোর্সটি সম্পন্ন করেছে। প্রবাসে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়ে মৌলিক আরবি কথোপকথনের এই কোর্স। ৩৫টি ভিডিওতে ১৪ ঘণ্টার এই কোর্সের ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের শিক্ষক মেহেদী হাসান।

তা ছাড়া বাংলাভাষীদের জন্য অনলাইনভিত্তিক অনেক প্রতিষ্ঠান এখন আরবি ভাষা কোর্সের আয়োজন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে- আসলাফ একাডেমি, ইসলামিক অনলাইন মাদরাসা, আল-হারামাইন ইসলামিক একাডেমি, কিউ অ্যারাবিক ডটনেট, অনলাইন অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আরবি বিশ্বের সমৃদ্ধ ও জীবন্ত ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম। মুসলিম হিসেবে আরবি ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান থাকা জরুরি। পবিত্র কোরআন ও দৈনন্দিন জীবনের ইবাদতগুলো আরবি ভাষায় পড়া হয়। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অর্থনীতি, কূটনীতি,

ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে আরবি ভাষাগত দক্ষতার ভূমিকা রয়েছে। তাই প্রাথমিক জ্ঞান লাভের পাশপাশি এ ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করাও গুরুত্বপূর্ণ।'

আরবি ভাষা পাঠদানে যুগোপযোগী পাঠ্যসূচি ও শিখন পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান রাজধানীর মুহাম্মদপুরে অবস্থিত মারকাযুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাওলানা মহিউদ্দীন ফারুকী। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, সবার মধ্যে আরবি ভাষা শেখার আগ্রহ তৈরি হওয়া খুবই প্রশংসনীয়। এ ক্ষেত্রে সুবিন্যস্ত পাঠ্যসূচির আলোকে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের মাধ্যমে পাঠদান করানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুবা শিক্ষার্থীরা একসময় এ আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। আরবি ভাষার সঙ্গে পবিত্র কোরআনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই আরবির প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি আলেমদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি।

ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের শিক্ষক হারুনুর রশীদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আরবি শুধুমাত্র একটি ভাষা নয়। বরং তা ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহক এবং জ্ঞান জগতের প্রবেশদ্বার। মূলত ইসলামকে সঠিকভাবে জানার আগ্রহ থেকে সবার মধ্যে আরবি ভাষা শেখার আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। আরবি ভাষা শিক্ষা দিতে অনলাইন ও অফলাইনে গড়ে ওঠেছে অনেক প্রতিষ্ঠান। ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি এ ভাষা পারস্পরিক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। তাই স্বল্পমেয়াদি কয়েকটি কোর্স সম্পন্ন করে ক্ষান্ত না হয়ে বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। কারণ শিক্ষার্থীর স্তর অনুসারে সঠিক কারিকুলাম ও পাঠ্যক্রম না হলে ভাষা শেখার আগ্রহ এক সময় হারিয়ে যাবে। তাই সাধারণ শিক্ষিতদের আগ্রহের বিবেচনা করে আরবি ভাষা পাঠদানে অভিজ্ঞ, দক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত সিলোবাস ও কারিকুলাম তৈরি করলে বাংলাদেশে আরবি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।'

প্রতিবছর ১৮ ডিসেম্বর বিশ্ব আরবি দিবস পালিত হয়। ২০১২ সাল থেকে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা বা ইউনেস্কোর উদ্যোগে দিবসটি পালিত হয়। এই বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো, 'আরবি : কবিতা ও শিল্পের ভাষা'। এ বছর আরবি ভাষাকে জাতিসংঘের ছয়টি দাপ্তরিক ভাষা ঘোষণার ৫০তম বার্ষিকী উদযাপিত হয়।

কপি

[কালের কণ্ঠ

প্রকাশ: ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ১৫:২৭

বাংলাদেশে আরবি ভাষা শেখার আগ্রহ বাড়ছে

মুহাম্মাদ হেদায়াতুল্লাহ]

শেষ কথা

"আল্লাহ তাঁর সেই বান্দার মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে, সেগুলো মনে রেখেছে, বুঝেছে এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কারণ কেউ নিজে ফকীহ্ (জ্ঞানী) না হয়েও ফিকহ্ (জ্ঞান) বহনকারী হতে পারে। আবার কেউ তার নিজের চাইতে বড় ফকীহ (জ্ঞানী) এর নিকটও ফিকহ্ পৌঁছে দিতে পারে।" [আবু দাউদ, তিরমিযী এবং আহমদ থেকে বর্ণিত]

আমরাই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব এবং আমাদেরকেই পৃথিবীকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ দিয়ে শাসন করতে হবে। জনগণ আমাদের কাছেই আসবে ইসলাম শিখতে। আমরাই তারা যাদেরকে পৃথিবী বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরণ করা হবে আমিল, ওয়ালী কিংবা মুজাহিদ হিসেবে। ঠিক সেভাবেই যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের প্রেরণ করতেন। আমরা জানি, মু'আজ বিন জাবাল যখন ইয়েমেনে প্রেরিত হয়েছিলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে তিনি আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নত ও তার ইজতিহাদের দ্বারা রায় দেবেন। সুতরাং, আমরা যদি সেই আলী, মু'আজ, আমর ইবনুল আস (রা)-দের সত্যিকার উত্তরসূরী হয়ে থাকি এবং আমরা যদি কিছুদিনের মধ্যে তাদের মতো দায়িত্বপ্রাপ্ত হই তখন কিভাবে আমরা উত্তমরুপে খিলাফতের অফিসকে চালাবো যখন আমরা আরবী ভাষার জ্ঞান রাখি না।

সুতরাং আমাদের আরবী ভাষা শিখতে হবে। শুধুমাত্র সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক যোগাযোগের আরবী ভাষা নয় যা আমাদের দেশের কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা একাডেমি শিক্ষা দেয়, বরং আমাদের আরবী শিখতে হবে দ্বীনকে বোঝার জন্য। ভাষা শিক্ষাকে আমাদের কঠিন কোনো কিছু মনে করা উচিত নয়। আর কেন আমরা আরবী ভাষা শেখাটা কঠিন মনে করব যখন আমরা জানি যে যাইদ (রা)-কে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) হিব্রু ভাষা শিখতে বলেছিলেন তখন তিনি তা মাত্র ১৫ দিনে সম্পন্ন করেছিলেন। তার সময়ে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বা একাডেমি ছিল না অথচ আমাদের সময়ে তা আছে। তার সময়ে কোনো টেকনোলজিও ছিল না তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্য অথচ আমাদের সময়ে তা আছে। আমরা দুনিয়ার বিভিন্ন কাজের জন্য ইংরেজি বা ফ্রেঞ্চ শিখতে পারলে আরবী কেন পারবো না। আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা নিয়ে আমাদের প্রত্যেকের এ কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করি যাতে তিনি আমাদের তাঁর কিতাবের ভাষার সঠিক জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"আর যারা আমার পথে চেষ্টা সংগ্রাম করে তাদের আমি অবশ্যই আমার পথ দেখিয়ে দেব। আর আল্লাহ অবশ্যই রয়েছেন তাদের সাথে যারা সবচেয়ে উত্তমরূপে কাজ সম্পাদন করে।" [আনকাবুত: ৬৯]

রেফারেন্স

১. https://www.dhakapost.com/religion/161216

২. https://archive.roar.media/bangla/main/history/origin-and-evolution-of-arabic-language

৩. https://languagegoln.com/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF/

৪. https://arabicliterature100.blogspot.com/2017/02/blog-post_58.html?m=1

৫. https://www.muslimmedia.info/2016/11/21/7-reasons-to-learn-arabic

৬. https://nizam-al-islam.weebly.com/2439248824822494247825032438248024762496-2477249424872494-24472480-2455249724802497246825092476-2451-24412478250924782468250324802474249724722480.html

৭. https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2023/12/21/1347659

৮. https://www.iirt.info/ten-reasons-why-muslims-should-learn-arabic/

৯. https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2024/03/09/1370104

১০. https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2023/12/18/1346763